ব্যোমকেশের কাহিনী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ব্যোমকেশের কাহিনী

চোরাবালি
অর্থমনর্থম্

চোরাবালি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশের কাহিনী

চোরাবালি

ুমার ত্রিদিবের বারম্বার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না ', একদিন পৌষের শীত-সুতীক্ষ্ণ প্রভাতে ব্যোমকেশ ও আমি তাঁহার াবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত-আট ` নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া, ফাঁকা যায়গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা .া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। র মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্যার দিগিন্দ্রই বেশী স্থান জুড়িয়া রহিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আমাদের পৌছাইয়া য়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

ব্যোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?'.

ত্রিদিব বলিলেন, 'যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শূয়োর, খরগোস পাওয়া যায়; ময়ুর, বনমুরগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু

রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; আজ সকালে আমি তাকে লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। কোনো আপত্তি নেই ত?'

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, 'আপত্তি!'

ব্যোমকেশ যোগ করিয়া দিল, 'তবে বাঘ নেই এই যা দুঃখের কথা।

ত্রিদিব বলিলেন, 'একেবারে যে নেই তা বলতে পার্ব্ব না; প্রতি বছরই এই সময় দু'একটা বাঘ ছুটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভয় করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না নিজেই ব্যাগ করবে।' কুমার হাসিতে লাগিলেন—'জমিদারী দেখবা ফুরসুৎ পায় না, তার এম্‌নি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্দুকে ঘরে, নয় ত জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার পাগল। টিপও অসাধারণ— মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে!

ব্যোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বললেন জমিদারীর—চোরাবালি? অদ্ভুত নাম ত!'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।' হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আর দে নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠ্‌তে কষ্ট হবে।' বলিয়া একটা হা তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল শরীর বেশ একটি আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশী দেরী হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—

চোরাবালিতে ডুবিয়া যাইতেছি; ব্যোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল; যতই বাহির হইবার জন্য হাঁকপাঁক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া যাইতেছি। শেষে নাক পর্য্যন্ত বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্য ভয়াবহ মৃত্যু যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচিত্র ভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল।

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়াগেল। কোনোমতে হাফ্-প্যাণ্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শট্-গ্যান্ অজস্র কার্ত্তুজ ও এক বেতের বাক্স ভরা আহার্য্য দ্রব্য আগে হইতেই রাখা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন পিছনের সীটে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কুয়াসায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল উষালোকের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ওভারকোটের কলারের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'সূর্য্যোদয়ের আগে না পৌঁছুলে ময়ূর বনমোরগ পাওয়া শক্ত হবে। এই সময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে—চমৎকার টার্গেট।'

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পথের দু'ধারে সমতল ধানের ক্ষেত; কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও সোনালি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটমূলে পুরু কালীর দাগের মত বনানী দেখা গেল; আমাদের রাস্তা তাহার একটা

কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট-কুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আসিয়া থামিল। আমরা পকেটে কার্ত্তুজ ভরিয়া লইয়া বন্দুক ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর ব্যোমকেশ একসঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্দুক চালনায় আমার এই প্রথম হাতে খড়ি, তাই একলা যাইতে সাহস হইল না ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্ব্বে স্থির হইল যে বেলা নটার সময় বনের পূর্ব্ব সীমান্তে ফাঁকা যায়গায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেইখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকাণ্ড বনের মধ্যে বড় বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর যেন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নীচে হরিণ, খরগোস—উপরে হরিয়াল, বনমোরগ, ময়ূর। প্রথম বন্দুক ধরিবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষচূড়া হইতে মৃত পাখীর পতনশব্দ, ছর্‌রার আঘাতে উড্ডীয়মান কুক্কুটের আকাশে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—একটা এপিক লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, বিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে—সঞ্চরমান লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা—এরূপ বিনোদ আর কোথায়? কিন্তু যাক্—পাখী শিকারের বহুল বর্ণনা করিয়া প্রবীণ বাঘ-শিকারীদের কাছে আর হাস্যাস্পদ হইব না।

আমাদের থলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অলক্ষিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কার্ত্তুজে—দশ নম্বর—সাতটা হরিয়াল মারিয়া আত্মশ্লাঘার সপ্তমস্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম—দৃঢ় বিশ্বা-

জন্মিয়াছিল আমার মত অব্যর্থ সন্ধান সেকালে অর্জ্জুনেরও ছিল না। ব্যোমকেশ দুইবার মাত্র বন্দুক চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই—থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বৃহত্তর শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে; তা ছাড়া, বাঘ না হোক্‌, ভাল্লুকের আশা সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার অদৃশ্য ভাল্লুক-লুব্ধ মন সেই দিকেই সতর্ক হইয়াছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে শুনিয়া মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা জঙ্গলের পূর্ব্বসীমা লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুমার ত্রিদিবের বন্দুকের আওয়াজ দূর হইতে বরাবরই শুনিতে পাইতেছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্ব্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাৎলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল খোলা যায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়—প্রায় সিকি মাইল চওড়া; দৈর্ঘ্যে কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্য্য-কিরণ পড়িয়া চক্‌ চক্‌ করিতেছে; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্ব্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। পুরানো সুদূর অতীতে হয় ত ইহা একটি স্রোতস্বিনী ছিল, তারপর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে—হয় ত ভূমিকম্পে—খাত উঁচু হইয়া গিয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুষ্ক বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে—না? ঐ যে দুর্য্যোধন পৌঁছে গেছে—চলুন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুর্চ্চি মোটর হইতে নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের সের উপর শাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত আমরা সেই ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমার এক কার্ত্তুজে সাতটা হারিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকণ্ঠ আহার ও অনুপান হিসাবে থার্ম্মো ফ্লাস্ক্ হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে কহিলেন, 'এই যে বালু-বন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারীর নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংশুর।' বলিযা পূর্ব্বদিক নির্দ্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?'

কুমার বলিলেন, 'না। মাইল তিনেক লম্বা হবে—তারপরে আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোনখানটায় আছে কেউ জানে না, কিন্তু ভয়ে

কোনো মানুষ বালির উপর দিয়ে হাঁটে না; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্য্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বালিতে কোথাও জল নেই বোধ হয়?'

কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, 'বলতে পারি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।' বলিয়া দক্ষিণদিকে যেখানে বালুর রেখা বাঁকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে রহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল—বিস্মিত ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বন্দুকধারী লোক একটা মৃত খরগোস কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেস্, মাথায় বয়-স্কাউটের মত খাকি টুপী, চামড়ার কোমরবন্দে সারি সারি কার্ত্তুজ আঁটা রহিয়াছে।

কুমার ত্রিদিব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'আরে হিমাংশু, এস এস।'

খরগোস মাটিতে ফেলিয়া হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'অভ্যর্থনা আমারই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষতঃ এঁদের।' কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন, 'তুমি বুঝি আর লোভ সামলাতে পারলে না? কিম্বা ভয় হ'ল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা ব্যাগ করে ফেলি?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আরে বল কেন? মহা ফ্যাঁসাদে পড়া

গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হ'ল না, দেওয়ানজী আট্‌কে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না। তাই রাগ ক'রে আজ সকাল-বেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর। কিছু না হোক দুটো বন-পায়রাও ত মারা যাবে।'

কুমার বলিলেন, 'হায় হায়—কোথায় বাঘ ভালুক আর কোথায় বন-পায়রা! দুঃখ হবার কথা বটে—কিন্তু যাওয়া হ'ল না কেন?"

হিমাংশুবাবু ইতিমধ্যে খাবারের বাক্সটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রফুল্লমুখে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এই অবসরে তাহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে, বেশ মজবুত পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একজোড়া উগ্র জার্ম্মান্ গোঁফ, মুখখানাকে অনাবশ্যক রকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাঘ-শিকারীর নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্ব্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। এক নজর দেখিলে মনে হয় লোকটা ভীষণ দুর্দ্দান্ত। কিন্তু তবু বর্ত্তমানে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত অর্দ্ধমুদিত নেত্রে কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে, বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর—মনের মধ্যে কোনো মারপ্যাচ নাই। সাংসারিক বিষয়ে হয় ত একটু অন্যমনস্ক, নিদ্রায় জাগরণে নিরন্তর বাঘ ভালুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধকরি বুদ্ধিটাও সাংসারিক ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম্ব সমাপনান্তে চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিয়া হিমাংশু-

বাবু বলিলেন, 'কি বললে? যাওয়া হ'ল না কেন? নেহাৎ বাজে কারণ; কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'হয়েছে কি?'

'হয়েছে আমার মাথা। জান ত, বাবা মারা যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তসিলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগে আছে;—উকিল মোক্তার পরামর্শ, সে সব ত তুমিই জানোই। যাহোক আম-মোক্তার-নামা দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্দি হওয়া গিছল এমন সময় আবার এক নূতন ফ্যাচাং—। মাস-কয়েক আগে বেবির জন্যে একটা মাষ্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশু দিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; যাবার সময় নাকি খান-কয়েক পুরোনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলক্লাম কাণ্ড। থানা পুলিশ হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, এটা আমার মামলাবাজ প্রজাদের একটা মারাত্মক প্যাঁচ।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'লোকটা এখনো ধরা পড়ে নি?'

বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'না। এবং যতক্ষণ না ধরা পড়ছে—' হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে! এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকে নি! আপনি ত একজন বিখ্যাত ডিটেকটিব, চোর ডাকাতের সাক্ষাৎ যম! (ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল,

সত্যান্বেষী) তা হ'লে মশায়, দয়া করে যদি দু'একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তা হ'লে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল-পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—'

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিশই খুঁজে বার করবে অপন। এসব যায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।'

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'পুলিশের কর্ম্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড় করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে ষ্টেশন আছে সব যায়গায় পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু এখনো ত কিছু করতে পারলে না। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আপনি কেসটা হাতে নিন্; সামান্য ব্যাপার, আপনার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না।'

ব্যোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা, ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন ত শুনি।'

হিমাংশুবাবু সঙ্কোচে হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'আমি কি সব জানি ছাই! তার সঙ্গে বোধ হয় সাকুল্যে পাঁচ দিনও দেখা হয় নি। যা হোক, যতটুকু জানি বলছি শুনুন। কিছুদিন আগে—বোধহয় মাস-দুই হবে—একদিন সকাল-বেলা একটা হ্যালাখ্যাপা গোছের ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। তাকে আগে কখনো দেখি নি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হ'ল না। তার গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, পায়ে ছেঁড়া চটিজুতা—রোগা বেঁটে দুর্ভিক্ষ পীড়িত চেহারা; কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে, চাকরীর অভাবে খেতে

পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকরী দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? পকেট থেকে বি-এস্‌সি'র ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা দেখে আমার একটু দয়া হ'ল, কিন্তু কি কাজ দেব? সেরেস্তায় ত একটা যায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির জন্যে একজন মাষ্টার রাখবার কথা গিন্নি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন। বেবি এই সাতে পড়েছে, সুতরাং তার পড়াশুনোর দিকে এবার একটু বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

তাকে মাষ্টার বাহাল করলুম, কারণ, অবস্থা যাই হোক ছোকরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। বাড়ীতেই বাইরের একটা ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ছোকরা কৃতজ্ঞতায় একেবারে কেঁদে ফেললে। তখন কে ভেবেছিল যে—; নাম? নাম যতদূর মনে পড়ছে, হরিনাথ চৌধুরী—কায়স্থ।

'যা হোক, সে বাড়ীতেই রইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হ'ত না। বেবিকে দু'বেলা পড়াচ্ছে, এই পর্য্যন্তই জানতুম। হঠাৎ সেদিন শুনলুম, ছোকরা কাউকে না বলে কয়ে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে, হয়েছে—আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝ থেকে কতকগুলো বাজে পুরোনো হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়েই আমার সর্ব্বনাশ করে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার না করা পর্য্যন্ত আমার নিস্তার নেই।'

হিমাংশুবাবু নীরব হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া শুনিতেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোকরা খেত কোথায়?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়ীতেই খেত। আদর যত্নের ক্রটি ছিল না, বেবির মাষ্টার বলে গিন্নি তাকে নিজে—'

এই সময় পিছনে একটা গাছের মাথায় ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া আমরা মাথা তুলিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বন-মোরগ নানা বর্ণের পুচ্ছ ঝুলাইয়া একগাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে। গাছ দু'টার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু নিমিষের মধ্যে বন্দুকের ব্রীচ্ খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিমাংশুবাবু ফায়ার করিলেন। পাখীটা অন্য গাছ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিল না, মধ্য পথেই ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি অদ্ভুত টিপ্।'

ব্যোমকেশ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, 'সত্যিই অসাধারণ।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন? ওর চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য্য বিদ্যে ওর পেটে আছে!—হিমাংশু, তোমার সেই শব্দভেদী প্যাচটা একবার দেখাও না।'

'আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জঙ্গলে ঢোকা যাক—'

'সে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে রুমাল বাঁধো।'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে ট্রীক্, আপনারা কতবার দেখেছেন—'

আমরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিযাছিলাম, বলিলাম, 'তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।'

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করা।" বন্দুকে একটা বুলেট

ভরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনিই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিন্তু দেখবেন কান দুটো যেন খোলা থাকে।'

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সুতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—যাহাতে হিমাংশুবাবু বুঝিতে না পারেন তিনি কোনদিকে গিয়াছেন—প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হিমাংশুবাবু এবার শুনুন।'

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটায় আঘাত করিলেন, ঠুং করিয়া শব্দ হইল।

হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। বন্দুকটা একবার তুলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আর একবার বাজাও।'

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সরিয়া আসিলেন।

শব্দের রেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল; দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাঁটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের সাজানো নাট্যমঞ্চে এরকম খেলা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক রকম জুয়াচুরী আছে। এ একেবারে নির্জ্জলা খাঁটি জিনিষ।

হিমাংশুবাবু চোখের রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'হয়েছে?'

আমাদের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ও

কথা থাক, আপনাদের সুখ্যাতি আর বেশীক্ষণ শুনলে আমার গণ্ডদেশ ক্রমে বিলিতি বেগুনের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌বে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো যাক।'

*　　*　　*

বেলা দেড়টার সময় শিকার-শ্রান্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাথ মাষ্টারের খাতা চুরীর কাহিনীটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। হিমাংশুবাবুরও কি জানি কেন, ব্যোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে সদ্য পরিচিত একজন লোককে খাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন; হয় ত তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিশই শীঘ্র এই ব্যাপারের একটা সমাধান করিযা ফেলিবে। সে যাহাই হোক ব্যোমকেশই প্রসঙ্গটাব পুনরুত্থাপন করিল, বলিল, 'আপনার হরিনাথ মাষ্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হ'ল না।'

হিমাংশুবাবু মোটরের ফুট বোর্ডে পা তুলিয়া দিযা বলিলেন, 'আমি যা জানি সবই প্রায় বলেছি, আর বিশেষ কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ী পৌঁছে দিযে যাই। তুমি বোধ হয় হেঁটেই এসেছ।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে ঘুর পড়ে বলে ওদিক দিয়ে মাঠে মাঠে এসেছি। ওদিক দিয়ে মাইল-খানেক পড়ে।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল-দুই। চল তোমাকে পৌঁছে দিই।' তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'আর যদি নেমন্তন্ন কর তা হ'লে না হয় দুপুরে স্নানাহারটা তোমার বাড়ীতেই সারা যাবে। কি বলেন আপনারা?'

আমাদের কোনো আপত্তিই ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি, গৃহস্বামী যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতেই রাজি ছিলাম। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা ত আজ আমারই অতিথি—এতক্ষণ এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়ীতে, আর দেরী নয়; খাওয়া দাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পাবেন। তারপর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ী ফিরলেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবং পারি যদি, ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাষ্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয় ত তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন।' বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবই সমাদর সহকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুশী হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ী তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর

হিমাংশুবাবুকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা হিমাংশু, যা ভেবেছিলুম তাই। হরিনাথ মাষ্টার শুধু খাতাই চুরি করে নি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে ছ'হাজার টাকাও গেছে।'

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ণ ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

'এবার ভট্টাচার্য্যিমশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।' বলিয়া ব্যোমকেশ মোটা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া বসিল।

গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিস্তৃত ফরাসের শয্যায় এক একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতেছিলাম। হিমাংশুবাবুর কন্যা বেবি ব্যোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটা পুতুলকে কাপড় পরাইতেছিল; এই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু তফাতে ফরাসের উপর মেরুদণ্ড সিধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া ছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাইলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন।

বস্তুত তাঁহাকে দেখিলে জপতপ ধ্যানধারণার কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। আমি ত প্রথম দর্শনে তাঁহাকে জমিদার বাড়ীর পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, মুণ্ডিত মুখ, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিন্দূরের টিকা। মুখে তপঃক্লিশ শান্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকার-পাগল সংসার-উদাসী জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন যে এই লোকটির তীক্ষ্ণ সতর্কতার উপর নির্ভর

করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্য অতিথির সম্বর্দ্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ইঁহারি কটাক্ষ ইঙ্গিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ব্যোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হরিনাথ লোকটা আপাত দৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। হ্যালা-ক্যাব্লা গোছের একটা ছোঁড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শয়তানী লুকোনো ছিল তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আমি মানুষ চিন্‌তে বড় ভুল করি না, এক নজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে-ছোঁড়া আমার চোখেও ধূলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করি নি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো কু-অভিপ্রায় আছে।

'প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামাকাপড়ের দুরবস্থা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু'জোড়া কাপড় দুটো গেঞ্জি দুটো জামা আর দু'খানা কম্বল বার করে দিলুম। একখানা ঘর হিমাংশু বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরোনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না; সেই ঘরে তক্তপোষ ঢুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল। ঠিক হ'ল, বেবি দু'বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলুম, অনাদি সরকার কিম্বা কোনো আম্‌লার বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আস্‌বে। আমলারা সবাই কাছে পিঠেই থাকে। কিন্তু আমাদের মা-লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্দর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাষ্টার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য্য হ'ল।

'তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল। আমি দু'দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলুম—দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা শুনতে চাইত! এমনিভাবে দু'মাস কেটে গেল।

'গত শনিবারে আমি সন্ধ্যের পরই বাড়ী চলে যাই। আমি যে-বাড়ীতে থাকি দেখেছেন বোধ হয়—ফটকে ঢুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়ীখানা পড়ে সেইটে। কয়েক মাস হ'ল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি—একলাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাত্রে আমার পুরশ্চরণ করবার কথা ছিল—তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্যোগ আয়োজন করে পূজোয় বসলুম। উঠ্‌তে অনেক রাত হয়ে গেল।

'পরদিন সকালে এসে শুনলুম মাষ্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না! ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল তখনো মাষ্টারের দেখা নেই। আমার সন্দেহ হ'ল, তার ঘরে গিয়ে, দেখলুম রাত্রে সে বিছানায় শোয় নি। তখন, যে আলমারিতে জমিদারীর পুরোনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই।

'গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মাম্‌লা মোকদ্দমা চলছে; সন্দেহ হ'ল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রু পক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক সুবিধা হয়; বুঝলুম, হরিনাথ তাদেরই গুপ্তচর, মাষ্টার সেজে জমিদারীর জরুরী দলিল চুরি করবার জন্যে এসে ঢুকেছিল।

'পুলিশে খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে সিন্দুক থেকে ছ' হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী থামিলেন, তারপর ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমার খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। টাকাটা পুঁটুলি বাঁধা অবস্থায় সিন্দুকের এক কোণে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে অনেকবার সিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটুলি খুলে দেখবার কথা একবারও মনে হয় নি। আজ সদর থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটুলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম; দেখি, নোটের তাড়ার বদলে কতকগুলো পুরোনো খবরের কাগজ রয়েছে।'

দেওয়ান নীরব হইলেন।

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ আবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তা হ'লে সিন্দুকের তালা ঠিকই আছে? চাবি কার কাছে থাকে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'সিন্দুকের দুটো চাবি, একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশুবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনোকালে ঠিক থাকে না, কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হই নি—ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছেই—'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেবিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, 'মা-লক্ষ্মীর মাষ্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই আশ্চর্য্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে ত?'

দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, 'যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্চে। পুলিশ ত আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি। কিন্তু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্চে না।'

বেবি পুতুল রাখিয়া ব্যোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাষ্টারমশাই কবে ফিরে আসবেন?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।'

বেবির চোখদুটি ছল ছল করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি মাষ্টারমশাইকে খুব ভালবাসো—না?'

বেবি ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা বল ত, সাত-নাম্ কত হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত? চৌষট্টি?'

বেবি বলিল, 'দূৎ! তুমি কিচ্ছু জানো না। সাত-নাম্ তেষট্টি। আচ্ছা, তুমি মা-কালীর স্তব জানো?'

ব্যোমকেশ হতাশ ভাবে বলিল, 'না। মা-কালীর স্তবও কি তোমার মাষ্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ—শুনবে?' বলিয়া বেবি সুর করিয়া আরম্ভ করিল—

'নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—'

কালীগতি ঈষদ্‌হাস্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।'

বেবি একটু ক্ষুণ্ণভাবে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'লোকটা মাষ্টার হিসেবে মন্দ ছিল না—বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'চলুন, মাষ্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।'

বাড়ীর সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ; দ্বারে তালা লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কষি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালা খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি আয়তনে ছোট। গোটা-দুই কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারি, টেব্‌ল চেয়ার তক্তপোষেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। দ্বারের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খুলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তক্তপোষের উপর বিছানাটা অবিন্যস্ত ভাবে পাট করা রহিয়াছে; টেবলের উপর সূক্ষ্ম একপুরু ধুলার প্রলেপ পড়িয়াছে; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দড়ি টাঙাইয়া কাপড় চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত। দেওয়ালে লম্বিত একখানি কালী-ঘাটের পটের কালীমূর্ত্তি হরিনাথ মাষ্টারের কলাপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের নীচে উঁকি মারিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, 'তাই ত, জুতোজোড়া যে একেবারে নূতন দেখছি। ও—আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!' জুতা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ দড়ির আল্‌নাটার দিকে গেল। আল্‌নায় কয়েকটা কাচা আকাচা কাপড় জামা ঝুলিতেছিল, সেগুলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার বলিল, 'ভারি আশ্চর্য্য!'

হিমাংশুবাবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল, তাহার দৃষ্টি ঘরের বিপরীত কোণে একটা কুলুঙ্গির উপর গিয়া পড়িল। সে দ্রুতপদে গিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, 'মাষ্টার কি চশ্‌মা পরত ?'

কালীগতি বলিলেন, 'ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে—পরত বটে। চশ্‌মা কি ফেলে গেছে নাকি ?'

চশ্‌মার কাচের ভিতর দিয়া একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সহাস্যে সেটা আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—আশ্চর্য্য নয় ?'

কালীগতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য্য বটে। কারণ যার চোখ খারাপ তার পক্ষে চশ্‌মা ফেলে যাওয়া অস্বাভাবিক। এর কি কারণ হতে পারে আপনার মনে হয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয় ত তার সত্যি চোখ খারাপ ছিল না, আপনাদের ঠকাবার জন্যে চশমা পরত।'

ইত্যবসরে আমি আর কুমার ত্রিদিব চশ্‌মাটা পরীক্ষা করিতেছিলাম। ষ্টীল ফ্রেমের নড়্‌বড়ে বাহুযুক্ত চশমা, কাচ পুরু। কাচের ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক নয়। চশ্‌মাটা অনেকদিনের ব্যবহারে পুরোনো হয়ে গেছে, আর কাচের শক্তিও খুব বেশী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ভুলও হতে পারে। তবে, মাষ্টার আর কারুর পুরোনো চশ্‌মা নিয়ে এসেছিল এটাও ত সম্ভব। যা হোক, এবার আলমারিটা দেখা যাক।'

খোলা আলমারিটার কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে

থাকে থাকে খেরো-বাধানো স্থূলকায় হিসাবের খাতা সাজানো রহিয়াছে—বোধ হয় সব সুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট খানা। ব্যোমকেশ উপরের একটা খাতা নামাইয়া দু'হাতে ওজন করিয়া বলিল, 'বেশ ভারী আছে, সের-চারেকের কম হবে না। প্রত্যেক খাতায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে!'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ খাতার গোড়ার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, পাঁচ বছর আগেকার খাতা, ইহার পর হইতে শেষ চার বছরের খাতা চুরি গিয়াছে। আরো কয়েকখানা খাতা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ হিসাব রাখিবার প্রণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল। প্রত্যেকটা খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ একাধারে জাব্‌দা ও পাকা খাতা। এক অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইয়াছে—অন্য অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিখিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্‌দা ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়।

গোড়া হইতে ব্যোমকেশ ব্যাপারটাকে খুব হাল্কা ভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধ হয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথায় সে একটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত পাইয়াছে; হয় ত যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

ঘরের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করি আপনি চান?'

মুহূর্ত্তকালের জন্য হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'হ্যাঁ—চাই বই কি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া ত দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা হ'লে আমাদের দু'জনকে এখানে থাকতে হয।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'নিশ্চয নিশ্চয়। সে আর বেশী কথা কি—'

ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে ফিরিযা বলিল, 'কিন্তু কুমাব বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা ওঁর অতিথি।'

কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। ব্যোমকেশ হিমাংশুবাবুর কাজ করিযা কিছু উপার্জ্জন করিতে চায় এরূপ সন্দেহও হয় ত তাঁহার মনে জাগিযা থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'বেশ ত, আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়—'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না। হয় ত কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষযে আগ্রহ না থাকে ত বলুন—চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি, বিষয়চিন্তাও কলকাতায ফেলে এসেছি। তাই, আপনি যদি আমার সাহায্য দরকার না মনে করেন, তা হ'লে আমি বরঞ্চ খুশীই হব।'

ব্যোমকেশ কুমার বাহাদুরের ভিত্তিহীন সন্দেহটার আভাস পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি আরো লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন,

'না না ব্যোমকেশবাবু, আপনারা থাকুন। যতদিন দরকার থাকুন। আপনারা থাকলে নিশ্চয় এ ব্যাপারের কিনারা করতে পারবেন। আমি রোজ এসে আপনাদের খবর নিয়ে যাব।'

হিমাংশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন। আমাদের থাকাই স্থির হইয়া গেল।

অতঃপর চায়ের ডাক পড়িল ; আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেলাম। প্রায় নীরবেই চা পান সমাপ্ত হইল। কুমার ত্রিদিব ঘড়ির দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিলেন, 'সাড়ে চারটে বাজে। হিমাংশু, আমি তা হ'লে আজ চলি। কাল আবার কোনো সময় আসব।' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কম্পাউণ্ডের বাহিরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এবং ব্যোমকেশ কুমারের সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত গেলাম। কুমার বাহাদুর নিজের জমিদারিতে আমাদের জন্য অনেক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—পুকুরে মাছ ধরা, খালে নৌ বিহার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যসনের আয়োজন হইয়াছিল। সে সব ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। মোটরের কাছে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কাজটায় আপনার কতদিন লাগবে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই এখনো বলতে পারছি না—আপনি আমাকে ঘোর অকৃতজ্ঞ মনে করছেন, মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—আমোদ আহ্লাদের অছিলায় একে উপেক্ষা করলে অন্যায় হবে।'

কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! কিন্তু আমার ত অতটা মনে হ'ল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—'

'টাকা যাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

'তবে ?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাষ্টার বেঁচে নেই।'

আমরা দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, 'সে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই মনে হচ্চে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবেন।'

কুমার উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, 'না না, ক্ষমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত মুলতুবি থাক। আপনি কাল আসবেন ত ? তা হ'লে আমাদের স্যুটকেসগুলোও সঙ্গে করে আন্‌বেন। আচ্ছা— আজ বেরিয়ে পড়ুন—পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

কুমারের মোটর বাহির হইয়া যাইবার পর আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। ফটক হইতে বাড়ীর সদর প্রায় একশত গজ দূরে, মধ্যের বিস্তৃত ব্যবধান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঞ্চি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ানের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বাগানে প্রবেশ করিলাম। শীতকালের দীর্ঘ গোধূলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসন্ন দিবার শেষ রক্তিম আভা পশ্চিমে জঙ্গলের মাথায় অলক্ষ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ চিন্তিত নতমুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছিল ; চিন্তার ধারা তাহার কোন্ সর্পিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হরিনাথ মাষ্টারের ঘরে সে এমন কি পাইয়াছে যাহা হইতে তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিঃঝুম পাড়াগাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অন্তর হইতে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না—গূঢ়নক্র হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রসন্নই দেখায়। ব্যোমকেশের সঙ্গে অনেক রহস্যময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বহিরবয়ব দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

একটা ইউকোলিপ্টাস্ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল, 'জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে হাঁটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি চুরি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন? চশমাটাও ফেলে যাবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'চশ্মা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরে নি একথা জানলে কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হ'ল যে জামা পরে যায় নি।'

আমি বলিলাম, 'তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওযানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি, ভাণ্ডার থেকে মাষ্টারকে দুটো গেঞ্জি আর দুটো জামা দেওযা হযেছিল। তা ছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আল্‌নায টাঙানো রযেছে।'

আমি একটু চুপ কবিযা থাকিযা বলিলাম, 'তা হ'লে তুমি অনুমান কব যে—'

ব্যোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইযা ছিল, হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিযা বলিযা উঠিল, 'ওহে দেখেছ? সবে মাত্র শুক্লপক্ষ পড়েছে। সে রাত্রে কি তিথি ছিল বলতে পারো?'

তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাঁদকে পর্য্যবেক্ষণ কবিযা বলিল, 'বোধহয—অমাবস্যা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।' তাহাব কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনাব আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিয়া কবি এবং নবপ্রণযীরা উত্তেজিত হইযা উঠে জানিতাম; কিন্তু ব্যোমকেশের মধ্যে কবিত্ব বা প্রেমের বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত না থাকা সত্বেও সে চাঁদ দেখিযা এমন উতলা হইযা উঠিল কেন বুঝিলাম না। যা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সমযেই বুঝিতে পারি না—ওটা অভ্যাস হইযা গিযাছে। তাই সে যখন ফিরিযা বাড়ীর অভিমুখে চলিল তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অংশটায আসিযা পৌছিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাড়ীর ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশী হইবে না। সিধা যাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউযের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলা বাগানের কিযদংশ ঘিরিযা যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

বেবি খুশী হইয়া বলিল, 'নিশ্চয় কিন্তু! তা না হ'লে আমি ঘুমুব না।'

'আচ্ছা বেশ।'

বেবি প্রস্থান করিলে কালীগতি বলিলেন, 'এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাষ্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি।'

'ও!' ব্যোমকেশ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি বলে কোনো কর্ম্মচারী আছে কি?'

'আছে। অনাদি জমিদার বাড়ীর সরকার।' বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আম্‌লাদের পাড়াতেই থাকে?'

কালীগতি বলিলেন, 'না। সে বহুকালের পুরোনো চাকর। বাড়ীর পিছন দিকে আস্তাবলের লাগাও কতকগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।'

'একলা থাকে?'

'না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক'দিন থেকে অসুখে ভুগছে; অনাদিকে বললুম কবিরাজ ডাকো, তা সে রাজি নয়। বললে, আপনি সেরে যাবে।—কেন বলুন দেখি?'

'না—কিছু নয়। কাছে পিঠে কারা থাকে তাই জানতে চাই। অন্যান্য আম্‌লারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ, তাদের জন্যে একটু দূরে বাসা তৈরী করিয়ে দেওয়া হয়েছে—সব সুদ্ধ সাত-আট ঘর আম্‌লা আছে। সহর থেকে যাতায়াত করলে সুবিধা হয় না তাই কর্ত্তার আমলেই তাদের জন্যে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।'

'সহর এখান থেকে কতদূর ?'

'মাইল-পাঁচেক হবে। সাম্নের রাস্তাটা সিধা পূব দিকে সহরে গিয়েছে।'

এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, আমার অস্ত্রাগার আপনাদের দেখাই।'

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান আহ্নিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খড়ম পায়ে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যস্থলে টেব্‌লের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলাম, মেঝেয় বাঘ ভাল্লুক ও হরিণের চামড়া বিছানো রহিয়াছে; দেয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি আল্‌মারি সাজানো। হিমাংশুবাবু একে একে আল্‌মারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিস্তল ও রাইফেলে আল্‌মারিগুলি ঠাসা। এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। প্রত্যেকটির গুণাগুণ—কোনটির দ্বারা কবে কোন জন্তু বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতখানি, কোন্ রাইফেলের গুলি বামদিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা তেল মাখানো সবই নিজে করেন।

অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্বচিৎ স্বভাব-

ছদ্মবেশী মানুষের মন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়াসহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিত্তটিও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরলচিত্ত— মনটিও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিধা পথে চলে, এ বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না।

আমাদের সঞ্চরমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারদের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। হিমাংশুবাবু এই সূত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়ত সঙ্ঘর্ষে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর আয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমায় খরচের অন্ত নাই; ফলে, এই কয় বছরে ঋণের মাত্রা প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয় সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, জমিদারী সংক্রান্ত অশান্তি তাহাঁকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বিপদের গুরুত্ব অনভিজ্ঞতা বশতঃ ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই মাঝে মাঝে অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয়-ব্যসন শিকারের প্রতি আরো আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্ত্তমানে এইরূপ।

কথায় বার্ত্তায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অতঃপর অন্দর হইতে আহারের ডাক আসিল। এই সময় অনাদি সরকারকে দেখিলাম; সে আমাদের ডাকিতে আসিয়াছিল। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে; অত্যন্ত শীর্ণ কোলকুঁজা চেহারা। গালের মাংস চুপ্‌সিয়া

অভ্যন্তরের কোন অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গিযাছে, ঝাঁকড়া গোঁফ ওষ্ঠাধর লঙ্ঘন করিযা চিবুকের কাছে আসিযা পড়িযাছে। চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি—যেন কোনো দারুণ দুষ্কৃতি করিয়া ধরা পড়িবার ভযে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইযা আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিযা লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিযা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর, একজন ভৃত্য আমাদের পথ দেখাইযা শযন কক্ষে লইয়া গেল। ভৃত্যটির নাম ভুবন—সেই হিমাংশুবাবুর খাস বেযারা। শয়ন কক্ষে ইজিচেযারে বসিযা আমরা সিগারেট ধরাইলাম; ভুবন মশারি ফেলিযা, জলের কুঁজা হাতের কাছে রাখিযা, ঘরের এটা-ওটা ঝাড়িযা ঝাড়ন স্কন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি ত হরিনাথ মাষ্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চশমা পরে থাকৃত ?'

আমরা যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়াছি তাহা ভুবন বোধকরি জানিত, তাই কথা কহিবার সুযোগ পাইযা সে উৎসুকভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই ত চশমা পরে থাকতেন। একদিন চশমা না পরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হোঁচট্ খেযে পড়ে গেলেন। বিনা চশমায তিনি এক-পা চলতে পারতেন না বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার ?'

ভুবন হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু, এক জোড়া। তাও সরকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-জোড়া

পরে তিনি এসেছিলেন সে ত এমন ছেঁড়া যে কুকুরেও খায় না। আমরা সেই দিনই সে জুতো টান মেরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'

'বটে! আচ্ছা, মাষ্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা-কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে সেটা কি মাষ্টার সঙ্গে করে এনেছিল?'

'আজ্ঞে না হুজুর, মাষ্টারবাবু একটি খড়্কে কাঠিও সঙ্গে করে আনেন নি। ও ছবি দেওয়ানজীর কাছ থেকে মাষ্টারবাবু একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙিয়েছিলেন।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু চাই না হুজুর?'

'না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার? বাড়ীতে পাঁজি আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার?'

ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু সে জমিদার বাড়ীর লেফাপা দুরস্ত চাকর, সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'এখনি কি চাই হুজুর?'

'এখনি হলে ভাল হয়।'

'যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।'

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর, হঠাৎ অতি সন্নিকটে একটানা বিকট একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড়্মড়্ করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু তখনি বুঝিলাম অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ-ছ'টা শৃগাল একত্র হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সম্মিলিত উর্দ্ধস্বরে যাম

ঘোষণা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।

এই সময় ভুবন পাঁজি হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ও কি হে! বাড়ীর এত কাছে শেয়াল ডাকছে?'

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, 'আসল শেয়াল নয় হুজুর। বেবিদিদি আজ সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শুনবেন। তাই তিনিই ডাকছেন।'

আমি বলিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেবেলা বেবি বলছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা ত দেওয়ানজীর! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝবার জো নেই!'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারেন।' বলিয়া পাঁজি ব্যোমকেশের পাশে টেবলের উপর রাখিল।

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্ব্বাঙ্গের পেশী টান হইয়া শক্ত হইয়া আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম,'কি হে?'

ব্যোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখ দিয়া হাতটা একবার চালাইয়া বলিল, 'কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভুবন প্রস্থান করিল!

ব্যোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে একটা পাতায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পড়িয়া সে পাঁজি আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'এই ত্যাখ।'

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

পাঁজির নির্দ্দিষ্ট পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে-রাত্রে মাষ্টার নিরুদ্দেশ হইয়া যায় সে-রাত্রিটা ছিল অমাবস্যা।

পরদিন সকাল সাতটার সময গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—তখনো সমস্ত বাড়ীটা সুপ্ত। একজন ভৃত্য বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে শীতকালে বেলা আটটা সাড়ে আটটার পূর্ব্বে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইহাই এ বাড়ীর রেওয়াজ।

এই দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায়? আকাশে একটু কুযাশার আভাস ছিল; সূর্য্যের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। আমার মন উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'চল ব্যোমকেশ, এখন ত তোমার কোনো কাজ হবে না; জঙ্গলে গিয়ে দু'চারটে পাখী মারা যাক। তারপর এদের ঘুম ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে ফিরে আসা যাবে।'

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যাহা পাই তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়া দিই। বিশেষত কাল বন্দুক দুটা কুমারবাহাদুর এখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'চল।'

বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম। যে চাকরটা ঝাঁট দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করায় সে জঙ্গলে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল; বলিল, এই পথে সিধা যাইলে বালির পাশ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব। আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমির উপর দিয়া চলিলাম।

কুয়াসার জন্ম ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজিল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরে বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা রহিয়াছে, তাহার কোলের কাছে বালু বেলা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে —দূর হইতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা লম্বা থাল জঙ্গলের পাদমূল বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যেদিকে চলিয়াছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণপ্রান্তটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া একটা অনুচ্চ পাড়ের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; অতঃপর দক্ষিণ দিকে আর বালি নাই।

মিনিট-পনেরো হাঁটিবার পর পূর্ব্বোক্ত পাড়ের কাছে আসিয়া পৌছিলাম; দেখিলাম পাড় একটা নয়—দুইটা। কোনো কালে হয় ত বালুর দক্ষিণ দিকে জলরোধ করিবার জন্য একটা উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল—বর্ত্তমানে সেটা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্দাজ পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

আমরা নিকটতর ঢিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহার পরেই অনিশ্চিত ভয়সঙ্কুল বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোনখানটায় সেই ভয়ানক চোরাবালি কে বলিতে পারে?

বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। সেটি একটি অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙনের দক্ষিণ মুখটি আগুলিয়া এই কুটীর পড়ি পড়ি হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মটকা

দেখা যায় না। ছিটা বেড়ার দেওয়াল, মাটি লেপিয়া জলবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল; এখন প্রায় সর্ব্বত্রই মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উই-ধরা হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের দু'চালা খড়ের চালটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পচিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা গলিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কেহ বাস করে নাই।

বনের ধারে লোকালয় হইতে বহুদূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ একটি কুটীর দেখিয়া আমাদের ভারি বিস্ময় বোধ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই ত! চল ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশে শাঁই শাঁই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বন-পায়রা মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকে টোটা ভরিয়া ফায়ার করিল। আমার একটু দেরী হইয়া গেল, যখন বন্দুক তুলিলাম তখন পায়রার ঝাঁক পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের আওয়াজে একটা পায়রা নিম্নে বালুর উপর পড়িয়াছিল সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—পথ এত বেশী ঢালু যে পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের হে! মরা পাখী ত আর উড়ে পালাবে না। চল ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে।'

তখন, যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয়া প্রবেশ করিলাম তাহার

কবাট নাই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাকারির আগড় লাগিযা আছে।

ঘরের মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্ব্বে গোময়লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িযা স্থানটাকে আকীর্ণ করিযা রাখিয়াছে। ঘরটি চওড়ায় ছয় হাতের বেশী হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্যে দুই বাঁধের মধ্যবর্ত্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিযা যাইতে হয; অন্য পথ নাই।

ব্যোমকেশ ঘরের অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'সম্প্রতি এ ঘরে কোনো মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখেছ? ঐ কোণে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের যাতাযাত আছে।'

মানুষের যাতাযাত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। রাখাল বালকেরা এদিকে রু চরাইতে আসে, হয় ত এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা দ্বিপ্রহর াপন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অন্য দ্বারের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখীর দিকেই পড়িয়া ছিল।

কিন্তু পাখী কোথায়? পাখীটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিলাম; অথচ কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ব্যোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওহে তোমার পাখী কৈ? সত্যিই কি মরা পাখী উড়ে গেল নাকি?'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখীর একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'তাই ত!'

'একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয় ত আশে পাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বালুর উপর পদার্পণ করিতে যাইব, ব্যোমকেশের একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমার কোটের কলার চাপিয়া ধরিল।

'থামো—'

'কি হ'ল ?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম।

'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সদ্য-ছোঁড়া কার্ত্তুজের শূন্য খোলটা ব্যোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশহাত দূরে বালুর উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর।' চাপা উত্তেজনায় তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লাল রঙের খোলটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ!

কার্ত্তুজ খোলের ভারী দিকটা নামিয়া গিয়া সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই চোরাবালি! এবং ইহাতেই আমি গবেশের মত এখনি পদার্পণ করিতে যাইতেছিলাম। ব্যোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত ভাবিয়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের চোখ-দুটা উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাঁহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলা ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। সে বলিল, 'দেখলে! উঃ কি ভয়ানক! কি ভয়ানক।'

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে সে কেবল অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিল, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক।' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরা বাকারি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল, ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাবালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ যতদূর পর্য্যন্ত বাকারি ফেলা হইল সব বাকারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বাহুবেষ্টন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় জমিদার হয়ত প্রজাদের জীবন রক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি একথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে। বুঝ্‌লে?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাঃ! ঘরটি কি চমৎকার যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? পিছনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত দূরে গভীর বন—দুধারে বাঁধ। কে এটি তৈরী করেছিল জান্‌তে ইচ্ছে করে।'

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে

তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ার নীচে দিয়া একজন হাফ্-প্যান্ট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ার বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু।

হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।' তারপর গলা চড়াইয়া বলিল,—'অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখীরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্ম্‌স্ অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শিগগির পুলিশের হাতে পড়বে।'

আমি বলিলাম, 'এবার কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।'

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, 'তারপর, কিছু পেলেন?'

'কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!' বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল।

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম; চাকরটা বললে আপনারা এদিকে এসেছেন—একটু ভাবনা হ'ল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তা হ'লে আপনাদের পাখীমারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছররা কোনো কাজেই লাগবে না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'ঠিক যে এসেছেই একথা জোর করে কেউ

বলতে পারছে না। আমার গয়লাটা বলছিল যে গরুগুলো সমস্তরাত খোঁয়াড়ে ছটফট করেছে, তাই তার আন্দাজ যে হয় ত তারা বাঘের গন্ধ পেয়েছে। তা ছাড়া, দেওয়ানজী বলছিলেন তিনি নাকি অনেক রাত্রে বাঘের ডাকের মতন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। যা হোক, চলুন এবার ফেরা যাক। এখনো চা খাওয়া হয় নি।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে আটটা। চলুন! আচ্ছা, এই খোড়ো ঘরটা কার? এরকম নির্জ্জন স্থানে কে এই ঘর তৈরী করেছিল? কেনই বা করেছিল? কিছু জানেন কি?'

হিমাংশু বাবু বলিলেন, 'জানি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

তিনজনে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, 'বছর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক'বছর হ'ল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়ীতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা, মাথায় জটার মত চুল, অজস্র গোঁফদাড়ি, পাঁচহাত লম্বা এক জোয়ান। পরণে স্রেফ্ একটি নেংটি, চোখদুটো লাল টক্‌টক্ করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে 'তুই তুকারি' করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে অতিথি থেকে সাধনা করতে চান।

সাধু সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—ও সব বুজরুকি আমার সহ্য হয় না; বিশেষতঃ ভেকধারীদের ঔদ্ধত্য আর স্পর্দ্ধা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে দূর করে দিচ্ছিলুম; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তাঁর বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যবায় অভিসম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখালেন;

কিন্তু আমি ঐ উলঙ্গ লোকটাকে বাড়ীতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজি হলুম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকবেন—আর ভাণ্ডার থেকে তাঁর নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অগত্যা রাজি হলুম।

'বাবাজী তখন এই যায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস-ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অবশ্য উনি আগেও শাক্তই ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।'

'যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে।'

গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বারান্দায় টেবল পাতিয়া তাহার উপরে চা, কচুরি, পাখীর মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহার্য্য ভুবন খানসামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহার্য্য বস্তুর সৎকারে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎকার কার্য্য অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। কুমার ত্রিদিব অবতরণ করিলেন।

মোটরের পশ্চাতে আমাদের সুটকেস কয়টা বাঁধা ছিল, সেগুলা

নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কদ্দূর ?'

ব্যোমকেশ অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বেশী দূর নয়। তবে দু'এক দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার সহরে যাওয়া দরকার। পুলিশের কাছ থেকে কিছু খোঁজ খবর নিতে হবে।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'বেশ ত, চলুন আমার গাড়ীতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার একটু সময় লাগবে; সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বেরুলে বোধহয় ভাল হয়।'

কুমার বলিলেন, 'সে কথাও মন্দ নয়। হিমাংশু, তুমি চল না হে খুব খানিক হৈ হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন সহরে যাওয়া হয় নি।'

হিমাংশুবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক। আমরা দু'জনে গেলেই যথেষ্ট হবে।' বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইসারা ছিল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন।

বেলা এগারোটার সময় ব্যোমকেশ কুমারের গাড়ীতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, 'চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্ত্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।'

তাহাদের গাড়ী ফটক পার হইয়া যাইবার পর, হিমাংশুবাবুর মুখ

দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আবার আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আমাদের মুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমাংশুবাবুও কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন। ব্যোমকেশ সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইল। ব্যোমকেশের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেকটিব তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম; তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না। শেষে বলিলাম, 'হরিনাথ মাষ্টার যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শিগগির বার করতে পারত না।'

দুজনেই চমকিয়া উঠিলেন—'বেঁচে নেই!'

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যোমকেশ অবশ্য বারণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, 'যথাসময় সব কথা জানতে পারবেন।'

অতঃপর বারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমাংশুবাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু হরিনাথের মৃত্যু সংবাদ যে তাঁহাদের দু'জনকেই বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

দুপুর-বেলাটা বোধ করি নিঃসঙ্গভাবে ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইত ; কারণ হিমাংশুবাবু আহারের পর একটা জরুরী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু বেবি আসিয়া আমাকে সঙ্গদান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই ব্যোমকেশের খোঁজ খবর লইল এবং সকাল-বেলা মেনির সন্তান প্রসবের জন্য আসিতে পারে নাই বলিযা যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজেদের পারিবারিক বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, 'মা আজ তিনদিন ভাত খান নি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর অসুখ করেছে বুঝি ?

মাথা নাড়িযা গম্ভীরমুখে বেবি বলিল, 'না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

এবিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভদ্রোচিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, একটা সবুজ রঙের সিডান বডির মোটর গারাজের দিক হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীখানি সাবধানে ফটক পার হইয়া সহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইযা গেল। দেখিলাম, চালক স্বয়ং হিমাংশু-বাবু। গাড়ীর অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'আমাদের নতুন গাড়ী।'

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংশুবাবু ঠিক যেন চোরের মত মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন ? সঙ্গে কেহ ছিল

কি ? তিনি গোড়া হইতেই আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে ; তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করিতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য কিছু জানেন ? তিনি কি জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভীত-দৃষ্টি রুগ্নকায় অনাদি সরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল কি জন্য ? 'ও মহা-পাপ করি নি'—কোন্ মহাপাপ হইতে নিজেকে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বেবি আজ আবার একটা নূতন খবর দিল—হিমাংশুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া। হরিনাথ মাষ্টার কি এই কলহ রহস্যের অন্তরালে লুকাইয়া আছে !

'তুমি ছবি আঁকতে জানো ?' বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'জানি।'

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খু—ব ভাল ছবি।

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরাণী দেবী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একি তোমার মাষ্টারমশায়ের হাতের লেখা ?'

বেবি বলিল, 'হ্যাঁ।'

খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বেশীর ভাগই উচ্চ গণিতের অঙ্ক ; বেবির হাতে লেখা যোগ, বিয়োগ খুব অল্পই আছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এসব অঙ্ক কে করেছে ?'

বেবি বলিল, 'মাষ্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।'

দেখিলাম মিথ্যা নয়। খাতার অধিকাংশ পাতাই মাষ্টারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতব্য উচ্চ গণিতের অবতারণার সার্থকতা কি ?

খাতার পাতাগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে একস্থানে দৃষ্টি পড়িল—একটা পাতার আধখানা কাগজ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ, খাতার পরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা-দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া নখচিহ্নের মত দাগগুলা পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীর ভাবে বলিল, 'ওকি করছ! ছবি এঁকে দাও না!'

ছেলে-বেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন এই ধরণের বর্ণহীন চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা ম্যাজিক দেখবে ?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—দেখব।'

তখন খাতা হইতে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিষ ঘষিতে লাগিলাম; কাগজটা যখন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সন্তর্পণে সেই অদৃশ্য লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্ যেমন রাসায়নিক জলে ধৌত করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার মৃদু ঘর্ষণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিযাছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইযা উঠিল।

ওঁ হ্রীং…ক্লীং…

রাত্রি ১১…৫…অম…পড়িবে।

অসম্পূর্ণ দুর্বোধ অক্ষরগুলার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ওঁ হ্রীং ক্লীং—বোধহয় কোনো মন্ত্র হইবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাষ্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইযা দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই; সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার খাতার কুকুর বাঘ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশী করিলাম। মন্ত্র লেখা কাগজটা আমি ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর পশ্চাতে গারাজের দিকে চলিয়া

গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম; তিনি ভুবন বেয়ারাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতেছেন।

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুমার গাড়ী হইতে নামিলেন না; ব্যোমকেশকে নামাইয়া দিয়া, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন ব্যোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন, ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'ল?'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'বিশেষ কিছু হ'ল না। পুলিশের ধারণা হরিনাথ মাষ্টারকে প্রজারা কেউ নিজের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার তা মনে হয় না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। আমার ধারণা অন্য রকম।'

'আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই?'

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি কি করে বুঝলেন? ও, অজিত বলেছে। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চটিয়াছে; কিন্তু মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে, হয় ত কথাটা ইঁহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ব্যোমকেশ নির্জ্জনে পাইলেই আমার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, 'আমার বোধহয় আপনি ভুলই করেছেন ব্যোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবতঃ মরে নি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?'

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না—তাকে ঠিক জানা বলা চলে না ; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে? এই দারুণ শীতে?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে—রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সম্ভবত সেই ঘরটায় লুকিয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে ঐখানেই আছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না।

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিয়েছ ত?'

'না না—আমি শুধু ক'থায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি ত ও কথা বলতে বারণ কর নি।'

'তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বারণ কর তবে গাহিব না। এবং বারণ না করিলেই তারস্বরে গাহিব। যা হোক, আজ দুপুর-বেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই ; বোধ হয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্তত তাহার কাজের যে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন দ্বিপ্রহরে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি সব বলিলাম; মন্ত্রলেখা কাগজটাও দেখাইলাম। কাগজটা ব্যোমকেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নূতন কিছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—

'রাত্রি ১১টা ৪৫ মিঃ গতে অমাবস্যা পড়িবে। অর্থাৎ হরিনাথও পাঁজি দেখেছিল।'

হিমাংশুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ মুচ্‌কি হাসিল, কোন মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'দ্যাখ ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের অতিথি-রূপে পেয়ে তিনি খুব খুশী হন নি।'

ব্যোমকেশ মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংশুবাবু যে কত উঁচু মেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে ধারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওঁর মতন সহৃদয় প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। যেমন করে হোক, এ ব্যাপারের একটা রফা করতেই হবে।'

আমাকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি সরকারের রাধা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে শুনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে বলিয়া চলিল, 'সতের-আঠার বছরের মেয়েটি—দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।—দেখ

অজিত, যৌবনের উন্মাদনার অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই, বিশেষতঃ অপরাধী যদি স্ত্রীলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিসাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বাভাবিক অপরিণামদর্শিতাকেও হিসাব থেকে বাদ দিই। ফলে যে বিচার করি সেটা সুবিচার নয়। আইনেও grave and sudden provocation বলে একটা সাফাই আছে। কিন্তু সমাজ কোনো সাফাই মানে না; আগুনের মত সে নির্ম্মম, যে হাত দেবে তার হাত পুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে-লোক এই কঠিনতার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।'

ব্যোমকেশকে কথনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই; অনাদি সরকারের কন্যাকে দেখিয়া তাহার ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল কেন তাহাও বোধগম্য হইল না। আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কেবল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাসমোচন করিয়া বলিল, 'আরএকটা আশ্চর্য্য দেখছি, এসব ব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; শেষে ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়ের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, 'রাত হ'ল শোয়া যাক। এ ব্যাপারটা যে কি ভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নেই।' তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।'

আমি বলিলাম, 'যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তা হ'লে একটু স্পষ্ট করে বল। জ্ঞাতব্য কোনো কথাই আমি এখনো বুঝ্‌তে পারি নি।'

'কিছু বুঝো নি?'

'কিছু না।'

'আশ্চর্য্য! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ সহরে গিয়ে ঘুচে গেছে। সমস্ত ঘটনাটি বায়স্কোপের :ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সহরে সারাদিন কি করলে?'

ব্যোমকেশ জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'মাত্র দুটি কাজ। ইষ্টিশানে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকিয়ে বসেছিলুম। তারপর রেজিষ্ট্রি অফিসে কয়েকটি দলিলের সন্ধান করলুম।'

'এইতেই এত দেরী হ'ল?'

'হ্যাঁ। রেজিষ্ট্রি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তদ্বির করতে হ'ল।'

'তারপর?'

'তারপর ফিরে এলুম।' বলিয়া ব্যোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।'

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম, আর কোনো কথা কহিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিদ্রাদেবীর ছায়া মঞ্জীর মাথার মধ্যে

রুমঝুম করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুট্ খুট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ব্যোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?'

বাহির হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কালো রঙের কম্বল গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিষ দেখাতে চাই।—অজিত বাবু, জেগে আছেন নাকি ? আপনিও আসুন।'

ব্যোমকেশ ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলিল, 'এত রাত্রে! ব্যাপার কি ?'

কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেপ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতির অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।

বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার রাত্রি, বহুপূর্ব্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ মন্থর একটা বাতাস যেন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ এহেন রাত্রে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল। কতদূর যাইতে হইবে! ব্যোমকেশই বা এমন নির্ব্বিচারে প্রশ্নমাত্র না করিয়া চলিয়াছে কেন ?

কিন্তু ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান

বেশীদূর নয়। কালীগতির বাড়ীর সদর দরজায় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, সেটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাতি উস্কাইয়া দিয়া কালীগতি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

কালীগতির বাড়ীতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকে না, কারণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জনমানবেরও সাড়াশব্দ পাইলাম না। লণ্ঠনের শিখা বাড়ীর অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্যান্য দু'একটা আসবার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। একপ্রস্থ সিঁড়ি ভাঙিয়া আমরা দোতলায় উঠিলাম; তারপর আর এক প্রস্থ সিঁড়ি। এই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিযা কালীগতি লণ্ঠন কমাইয়া রাখিযা দিলেন। দেখিলাম, আলিসা-ঘেরা খোলা ছাদে উপস্থিত হইয়াছি।

'এদিকে আসুন।' বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিসার ধারে লইযা গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিযা বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

উচ্চস্থান হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি গ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। তাই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগতির অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্রবালশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তিম ভাবে জ্বলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে। কিম্বা আগুনও হ'তে পারে। কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।'

'ও—যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন। তা—তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি ?' ব্যোমকেশের ব্যঙ্গহাসি শুনা গেল।

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাষ্টার।'

'ওঃ!' ব্যোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যে-বেলা আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু আলো জেলে সে কি করছে ?'

'বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জেলেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, শেষে মৃদুস্বরে বলিল, 'হতেও পারে—হতেও পারে। যদি সে বেঁচে থাকে—অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ। মনুষ্যসমাজ থেকে যে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে ছাড়া এই রাত্রে ওখানে আর কে আগুন জ্বাল্‌বে ?'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'হরিনাথ মাষ্টার হোক বা না হোক, লোকটা কে জানা দরকার। অজিত, এখন ওখানে যেতে রাজি আছ ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন ? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সব দিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন তা হ'লে এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো রকম শব্দ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি ? আলো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শব্দ হবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষে স্থির

হইল যে আজ রাত্রে যাওয়া নিরাপদ হইবে না ; কারণ আসামী যদি একবার টের পায় তাহা হইলে আর ওঘরে আসিবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে। আসামী যদি ভড়্‌কে না যায় তা হ'লে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব—বুঝেছেন ? তারপর সে যেম্‌নি আসবে—'

কালীগতি বলিলেন, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মৎলব যদি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তা হ'লে এই পর্য্যন্ত থাক্‌।'

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। যাইবার সময় ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তান্ত্রিকধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।'

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল ; তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভয়ঙ্কর চটেছেন।'

আমি বলিলাম, 'যাবার সময় তোমার দিকে যেরকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হ'ল। তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ওসব কথা বলবার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তান্ত্রিক—কাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও কায়মনোবাক্যে তাই আশা করছি।'

তাহার কথা ঠিক বুঝতে পারিলাম না। কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা কওয়া তাহার অভ্যাস নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে জানিয়া বুঝিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, 'তার মানে? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চটিয়ে কোন লাভ হ'ল নাকি?'

'সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন ঘুমিয়ে পড়।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশুবাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম—নানা কথাবার্ত্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্পে আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্ত করিয়া ব্যোমকেশ কালীগতিকে একান্তে লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে ত?'

কালীগতি চিন্তান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি কি বিবেচনা করেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিবেচনায় যাওয়াই ঠিক, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আজ রাত্রি দশটা নাগাদ চন্দ্রাস্ত হবে, তার আগেই আমি আর অজিত গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরব।'

কালীগতি বলিলেন, 'যদি না আসে?'

'তা হ'লে বুঝ্‌ব আমার আগেকার অনুমানই ঠিক, হরিনাথ মাষ্টার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বলিলেন, 'বেশ, কিন্তু ঘরটা এখন গিয়ে একবার দেখে এলে ভাল হ'ত। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন। ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আবার রাত্রে সেখানে যাবার অসুবিধা হবে।'

ঘরটা যে আমরা আগে দেখিয়াছি তাহা ব্যোমকেশ ভাঙিল না।

যথা সময় তিনজনে বনের ধারে কুটীরে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেঝের উপর একস্তূপ ছাই পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরের আর কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবাট খুলিয়া বালুর দিকে লইয়া গেলেন। বালুর উপর তখন সন্ধ্যার মলিনতা নামিয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ। এদিকটা ত বেশ, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

আমিও দেখাদেখি বলিলাম, 'চমৎকার!'

কালীগতি বলিলেন, 'আপনারা আজ রাত্রে এই ঘরে থাকবেন বটে কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।'

আমি বলিলাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না। যা হোক, আশা করি বাঘের গুজবটা মিথ্যে—বন্দুক আনবার দরকার হবে না; তবে সাবধানের মার নেই, আপনাদের সতর্ক করে দিই। যদি রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেরিয়ে এসে আগল লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢোকে, বালির ওপর যেতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল, 'সেই ভাল—বন্দুকের হাঙ্গামায় দরকার নেই। অজিত আবার নূতন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয় ত বিনা কারণেই আওয়াজ করে বসবে; ফলে শিকার আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসিয়া গল্পগুজব হইল। এক সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ নির্ভরশীল লোককে জেনে শুনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়, তার শাস্তি কি?'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মৃত্যু। A tooth for tooth, an eye for an eye!'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিল—'অজিত, তুমি কি বল ?'

'আমিও তাই বলি।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, 'হিমাংশুবাবু, আজ রাত্রে আমরা দুজনে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়েয় লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি! কেন ?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে সাহস হয় না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ, নিশ্চয় যাব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকারে ইঙ্গিতেও কেউ না জানতে পারে। তা হ'লেই সব ভেস্তে যাবে। শুনুন, আমরা আন্দাজ সাড়ে নটার সময় বাড়ী থেকে বেরুব; আপনি তার আধঘণ্টা পরে বেরুবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমন কি, আমাদের যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

'আর আপনার সব চেয়ে ভাল রাইফেল্‌টা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।'

রাত্রি নটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে নটা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

পাশে তাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কালীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন? বন্দুক নেন্ নি দেখছি। বেশ—মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন।'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত যাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িবে। কালীগতির মৃদু-কথিত 'দুর্গা দুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিল, নিমেষের জন্ম একবার জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল, 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো।'

দু'জনে উক্তরূপে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম।

আধঘণ্টা পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। ব্যোমকেশ ডাকিল, 'হিমাংশুবাবু আসুন।'

হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু'একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম-দ্যুতি সময়ের নিঃশব্দ সঞ্চার জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় একটা বিকট গম্ভীর শব্দ

শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্য বাঘের ক্ষুধার্ত্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, 'বাঘ।' তাঁহার রাইফেলে খুট করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন।

বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়াছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গাঢ়তর দেহরেখা অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হিমাংশুবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'শব্দভেদী'—ব্যোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনিতে পাইলেন কি না জানি না, তিনি কুটীরের বাহিরে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বাহির হইল। শব্দ হইল—কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুরুভার পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'পড়েছে। ব্যোমকেশবাবু, টর্চ্চ বার করুন।'

টর্চ্চ ব্যোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে আগে যাইতে যাইতে বলিল, 'আসুন।'

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'বেশী কাছে যাবেন না; যদি শুধু জখম হয়ে থাকে—'

কিন্তু বাঘ কোথায়? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কম্বল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চ্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার উপর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'একি! এ যে দেওয়ানজী!'

দেওয়ান কালীগতি কাৎ হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাহার রক্তাক্ত নগ্ন বক্ষ হইতে কম্বলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাঁহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গতাসু। যদি প্রেতলোক বলে কোনো রাজ্য থাকে তা হ'লে এতক্ষণে হরিনাথ মাষ্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর মুলাকাত হয়েছে।'

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে মর্ম্মপীড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

* * * *

হিসাবের খাতা কয়টা হিমাংশুবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, একলক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।'

আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়াছিলাম। কালীগতির মৃত্যুর পর দুইদিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া হিসাবের খাতা চারিটা ও আরও অনেক দলিল ব্যোমকেশ বাহির করিয়াছিল।

হিমাংশুবাবুর চক্ষু হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত

হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিলেন, ব্যোমকেশের কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না—ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমি টুক্‌রো টুক্‌রো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেরেছি তা আপনাকে বলছি শুনুন। কিন্তু তার আগে এই রেজিষ্টি দলিলগুলো নিন।'

'কি এগুলো ?' বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যে-মহাজনের কাছে তমস্থক লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমস্থক রেজিষ্ট্রী করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেই সব তমস্থক আর তার বিক্রি কবালা।'

'কালীগতি এইসব তমস্থক কিনেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আপনারই টাকায় কিনেছিলেন ; যাকে বলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো।'

হিমাংশুবাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারেন, কারণ কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন না। তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলাম করে নেবেন ভেবেছিলেন—আরো বছর-দুই এইভাবে চালাতে পারলে করতেনও তাই। কিন্তু মাঝ থেকে ঐ হ্যালাখ্যাপা অঙ্ক-পাগলা মাষ্টারটা এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'না না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।'

ব্যোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'গোড়া

থেকেই বলছি। হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিষয় পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারি সুবিধা পেলেন। হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তার মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই—সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু কিছু টাকা তছরুপ করিতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু নাল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশী গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক মস্ত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে রইল না; আদালতে ন্যায্য এবং ন্যায়-বহির্ভূত দুই রকমই খরচ আছে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে গোঁজামিল দেওয়া চলে। কালীগতির চুরীর খুব সুবিধা হ'ল।

'প্রথমটা বোধহয কালীগতি কেবল চুরি করবার মৎলবেই ছিলেন, তার বেশী উচ্চাশা করেন নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তান্ত্রিক এসে হাজির হ'ল—এবং আপনি প্রথমেই তার বিষ-নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিকে দেয়; কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

'স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্ম্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্ম্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরুর প্ররোচনায় অন্নদাতার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেম্‌নি কার্য্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল-

খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই এই ওজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ালেন, এবং শেষে মহাজনের কাছ থেকে আপনারই টাকায় সেই তমসুক কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

'এই ভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হ'ল। আপনি তাকে বেবির মাষ্টার রাখলেন। বড় ভালমানুষ বেচারা, দু'চার দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল; কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্ত্তির এক পট হরিনাথ তাঁর কাছ থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখলে।

'কিন্তু শুধু ধর্ম্মে তার পেট ভরে না—সে অঙ্ক পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়,আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কল্পিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

'একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেলে। অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতা-গুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে দেখা করতে সে সাহস করে না। এ অবস্থায় যা সব চেয়ে স্বাভাবিক সে তাই করলে—কালীগতিকে গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

'কালীগতি দেখলেন—সর্ব্বনাশ! তাঁর এত দিনের ধারাবাহিক চুরি

ধরা পড়েযায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং সেই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তাঁর দুষ্কৃতির প্রমাণ থেকে যাবে। এতদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেন নি এই অনুতাপ তাঁকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুললে।

'এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোরা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায়?

'যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালির সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন; কারণ চোরাবালিটা কাপালিকের কুঁড়ের ঠিক পিছনেই। আমরাও সেদিন সকালে পাখী মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

'কালীগতি মাষ্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাষ্টার মরবে অথচ কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে মরেছে। তাঁর ওপর সন্দেহের ছায়াপাত পর্য্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্দ্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

গত অমাবস্যার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, 'তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও ত আজ রাত্রে ঐ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর।' হরিনাথ রাজি হ'ল; সে বেবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলে।

'রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হ'ল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরবার দরকার নেই; এমন কি সে চশমাটাও সঙ্গে নিলে না—কারণ অমাবস্যার রাত্রে চশমা থাকা না থাকা সমান।

'কালীগতি তাকে কুটীর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন—'যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।'

'হরিনাথ জপে বসল। তারপর যথাসময় বাঘের ডাক শুনতে পেলে। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক, তা আমরাও সেদিন শুনেছি। হিমাংশুবাবুর মতন পাকা শিকারীও বুঝতে পারেন নি যে এ নকল ডাক। কালীগতি জন্তু জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথম দিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম।

'বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির ওপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয় ত সে করে ছিল কিন্তু তাও অর্দ্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।'

একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, 'কালীগতি কার্য্য সুসম্পন্ন করে ফিরে এসে সেই রাত্রেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতা সরিয়ে ফেললেন। তার পরদিন যখন হরিনাথকে পাওয়া গেল না তখন রটিয়ে দিলেন যে সে খাতা চুরি করে পালিয়েছে।

'হরিনাথের অন্তর্দ্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গূঢ়.তত্ত্ব আছে। তখন তিনি সিন্দুক থেকে ছ'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সহজেই কালীগতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হ'ল,

টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

'তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়ীতে আর একটা ব্যাপার ঘটছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি—বিধবার পদস্খলন, নূতন কিছুই নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জান্‌তে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে এসব অনাচার এ বাড়ীতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও।—কেমন, ঠিক কি না?'

শেষের দিকে হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আপনার মনে দয়া হ'ল; আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পার্‌লেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যেও জানাজানি হয়, এই জন্যে নিজে গাড়ী চালিয়ে তাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

'অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে সে আপনার মত মনিব পেয়েছে; অন্য কোনো মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

'সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা

জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম। রাধাকে দেখবার জন্যে ষ্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলুম। তার চেহারা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্রেজেডি অন্য রকম। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছে। লোকটা কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জলন্ত প্রমাণ পেলুম রেজিষ্ট্রী অফিসে। কিন্তু তাকে ধরবার উপায় নেই; যে খাতাগুলো থেকে তার চুরি-অপরাধ প্রমাণ হতে পারত সেগুলো সে আগেই সরিয়েছে। হয় ত পুড়িয়ে ফেলেছে, নয় ত হরিনাথের সঙ্গে ঐ চোরাবালিতেই ফেলে দিয়েছে।

'কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরে নি; প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বেলে রেখে এসে দুপুর রাত্রে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাত্রে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাজি হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বারণ করে দিলেন।

'আমাদের মারবার ফন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের জন্যে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই তখন তাঁর ভয় হ'ল যে এইবার তাঁর সব কল-কৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সঙ্কল্প

করলেন। আমিও এই সুযোগই খুঁজছিলুম; আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি করি নি। তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-ধর্ম্মকে গালাগালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

'পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বললেন, রাত্রে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনতে পাই তা হ'লে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই।'

'এই হ'ল সেদিন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমাকে সে-রাত্রে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়্‌ব?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, 'সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। হিমাংশুবাবু, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। সে যে ফাঁসি-কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছে এটা তার ভাগ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন রাত্রে আপনিই বলেছিলেন—a tooth for a tooth, an eye for an eye?'

এই সময় বাহিরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে কুমার ত্রিদিব প্রবেশ করিলেন; তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, 'হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড! দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?' বলিয়া কাগজখানা

বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কিছুই জানতাম না; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম তাই ক'দিন আসিতে পারি নি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা লইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল—

'চোরাবালি নামক উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন বন্ধুর সহিত রাত্রিকালে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশুবাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

'বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না।

'জমিদার হিমাংশুবাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পুলিশ-তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।'

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্য ভাঙিয়া কুমার ত্রিদিবকে বলিলেন, 'চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাব।'

অর্থমনর্থম্

স্নানাহারের জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলাম, বেলা সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল—এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া গিযা ফোন ধরিল।

শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, 'হ্যালো, কে আপনি? বিধুবাবু? ও···নমস্কার! নমস্কার! কি খবর? অ্যাঁ। বলেন কি?···আমায় যেতে হবে? তা বেশ···কত নম্বর?···ও আচ্ছা···আধঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুব···'

পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাইতে লাগাইতে ব্যোমকেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল, 'চল হে, একটু ঘুরে আসা যাক। একটা খুন হয়ে গেছে, বিধুবাবু স্মরণ করেছেন।'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্ বিধুবাবু? ডেপুটী কমিশনার?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ—তিনিই। আমার ওপর এত দয়া কেন হ'ল, বুঝতে পারছি না। নিজের ইচ্ছেয় যে ডাকেন নি, তা তাঁর কথার ভাবেই বেশ বোঝা গেল। বোধ হয়, ওপর থেকে হুড়ো এসেছে।

পুলিসের ডেপুটী কমিশনার বিধুবাবুর সঙ্গে কাজের সূত্রে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তিনি বেশ মুরুব্বী গোছের লোক ছিলেন, দেখা

হইলেই গ্রাম্ভারি ভাবে ব্যোমকেশকে অনেক সদুপদেশ দিতেন ; ব্যোমকেশ যে বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতায় তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ছোট, এই কথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিনীত-মুখে তাঁহার লেকচার শুনিত ও মনে মনে হাসিত। বিধুবাবু নিজের গুণ-গরিমার বর্ণনা করিতে করিতে অনেক সময় পুলিসের অনেক গূঢ় খবর প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। তাই, পুলিস-সংক্রান্ত কোনও খবর প্রয়োজন হইলেই ব্যোমকেশ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া একদফা লেকচার শুনিয়া আসিত।

যৌবনকালে বোধ করি বিধুবাবু একেবারে নির্ব্বোধ ছিলেন না ; বিশেষতঃ এই বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও কর্ম্মোৎসাহ ছিল। কিন্তু পুলিস-আইনের কলে পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিটা যন্ত্রবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। সহকর্ম্মীরা আড়ালে তাঁহাকে 'বুদ্ধুবাবু' বলিয়া ডাকিত।

যা হোক, তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া লইয়া আমরা দু'জনে বাহির হইলাম। বাসে যথাস্থানে পৌছিতে মিনিট কুড়ি সময় লাগিল। স্থানটা সহরের উত্তরাংশে, ভদ্র বাঙ্গালী পল্লীর কেন্দ্রস্থলে। নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে পড়িল, একটি বাড়ীর দরজায় দুই জন লালপাগড়ী দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে গোঁফে চাড়া দিতেছে ; বুঝিলাম, এই বাড়ীটাই ঘটনাস্থল।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া কনেষ্টবলদ্বয় পথ ছাড়িয়া দিল ; আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহির হইতে দেখিলে দোতলা বাড়ীটা ছোট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে বেশ সুপ্রসর ; অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী বলিয়া মনে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখের খোলা দালানে বড় বড় টবে

বাহারে তালগাছ সাজানো রহিয়াছে চোখে পড়িল। একটা প্রকাণ্ড কাচের পাত্রে লাল মাছ খেলা করিতেছে। দালানের তিন ধারে বারান্দা-যুক্ত কয়েকটি ঘর। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দালানের অপর প্রান্তে উপরে উঠিবার দু'মুখো সিঁড়ি।

ডানধারের একটা ঘরে অনেক লোক গিশ্‌গিশ্‌ করিতেছে দেখিয়া আমরা সেই দিকেই গেলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে টেব্‌লের সম্মুখে স্থূলকায় পক্বগুম্ফ বিধুবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন; বাড়ীর চাকরের এজেহার হইয়া গিয়াছে—বামুনের এজেহার হইতেছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া বিধুবাবুর কড়া কড়া প্রশ্নের জবাব দিতেছে ও ধমক খাইয়া চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছে। কয়েক জন নিম্নতন পুলিস-কর্ম্মচারী চারিদিকে বসিযা দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের দেখিযা বিধুবাবুর মুখ আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন, বসুন। বিশেষ কিছু নয়—একটা খুন হয়েছে, সামান্য ব্যাপার। কে আসামী, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওয়ারেন্টও ইস্যু করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কর্ত্তার হুকুম হ'ল আপনাকে ডাকতে—তাই—' বিধুবাবু সজোরে একটা গলাঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম—আপনিও দেখুন, যদিও দেখবার কিছুই নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি স্বয়ং যে কাজে রয়েছেন, তাতে আমার থাকা না থাকা সমান। যা হোক, কমিশনার সাহেব যখন হুকুম দিয়েছেন, তখন আপনার সহকারী হিসাবে আমি না হয় থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন ত? কে খুন হয়েছে?'

কৈতববাদের অপার মহিমা; দেবতা একটু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'এ বাড়ীর কর্ত্তা করালীবাবু গতরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন। মৃত্যুর

ধরণটা একটু নূতন গোছের, তাই সাহেব একেবারে ঘাব্‌ড়ে গেছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপার খুব সহজ। করালীবাবুর এক ভাগ্নে—মতিলাল, সেই এ কাজ করেছে ; আর করেই ফেরার হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'গোড়া থেকেই সমস্ত কথা না বললে আমার মত লোকের বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। দয়া ক'রে একটু খোলসাভাবে বলবেন কি ?"

বিধুবাবুর মুখের মেঘ সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, তিনি একটু গ্রাম্ভারি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'একটু বসুন। এই লোকটার এজেহার শেষ ক'রে নিই, তার পর সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলব।'

পাচক ব্রাহ্মণটা তখনও দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, বিধুবাবু তাহাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিলেন, 'সাবধান হয়ে বুঝে-সাম্‌ঝে কথা বলবে। মিথ্যে কথা একটি বলেছ কি সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতকড়া—বুঝলে ?'

বামুনঠাকুর শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে।'

বিধুবাবু তখন অসমাপ্ত জেরা আরম্ভ করিলেন, 'কাল রাত্রে তুমি মতিলালবাবুকে কখন্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে ?'

'আজ্ঞে, ঘড়ী ত দেখি নি—বোধ হয়, একটা দুটো হবে।'

'ঠিক ক'রে বল, একটা না দুটো ?'

'আজ্ঞে, বারোটা একটা হবে।'

বিধুবাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'আবার পাঁচ রকম কথা! ঠিক বল, বারোটা, না একটা, না দুটো ?'

পাচক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, বারোটা।'

দারোগা ক্ষিপ্রহস্তে জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিল।

'তিনি চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি প্রায় রোজ রাত্তিরেই বাড়ী থাকেন না।'

'আবার বাজে কথা! যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও। মতিলাল-বাবুকে তুমি উপর থেকে নেমে আসতে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে না হুজুর। তিনি যখন সদর-দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, তখন দেখেছিলুম?'

'ওপর থেকে নাম্‌তে দেখ নি? তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে আমি—আজ্ঞে আমি—'

'সত্যি কথা বল, তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

পাচক ভয়-কম্পিত স্বরে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, আমার দেশস্থ লোকরা এ বাড়ীর সামনে মেছ্‌ ক'রে থাকে—তাই রাতের কাজ-কর্ম্ম শেষ হ'লে তাদের আড্ডায় গিয়ে একটু বসি।'

'ওঃ—তুমি তখন আড্ডায় ব'সে গাঁজায় দম দিচ্ছিলে!'

'আজ্ঞে—'

'সদর-দরজা তা হ'লে খোলা ছিল?'

ভয়ে পাচকটা শুকাইয়া গিয়াছিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

বিধুবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তা হ'লে রাত্রে বাড়ীতে কারা আসা যাওয়া করেছিল, তুমি আড্ডায় ব'সে ব'সে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে, আর কেউ বাড়ী থেকে বেরোন্ নি।'

'হুঁ। তুমি কখন বাড়ী ফিরলে?'

'আজ্ঞে, মতিবাবু চ'লে যাবার আধঘণ্টা পরেই আমি বাড়ীতে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। সুকুমারবাবু তার আগেই ফিরে এসেছিলেন।'

'অ্যাঁ! সুকুমারবাবু আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছিলেন?'

'তা জানি না, হুজুর।'

'তিনি কখন্ ফিরেছিলেন?'

'মতিবাবু বেরিয়ে যাবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে।'

বিধুবাবুর ভ্রূকুটি গভীরতর হইল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, 'তুমি এখন যেতে পার। দরকার হ'লে আবার তোমার এজেহার হবে।'

পাচকঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল। বিধুবাবু তখন ঘর হইতে অন্য পুলিস-কর্ম্মচারীদের সরিয়া যাইতে বলিলেন। ঘরে কেবল আমি আর ব্যোমকেশ রহিলাম।

বিধুবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখলেন ত, এক জনকে জেরা করেই সব কথা বেরিয়ে পড়ল। ভাল জেরা করতে জানলে— যা হোক, আপনাকে গোড়া থেকে না বোঝালে আপনি বুঝতে পারবেন না। বাড়ীর সকলের জবানবন্দী নিযে যে সব কথা জানা গেছে, তাই মোটামুটি আপনাকে বলছি—মন দিয়ে শুনুন।'

ব্যোমকেশ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে শুনিতে লাগিল। বিধুবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'এই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা ছিলেন, তাঁর নাম করালীবাবু। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতায় চার-পাঁচখানা বাড়ী আছে, তা ছাড়া ব্যাঙ্কেও দু'তিন লাখ টাকা জমা আছে।

'স্ত্রী-পুত্র না থাকলেও তাঁর পুষ্যির অভাব নেই। তিনটি ভাগ্‌নে— মতিলাল, মাখনলাল আর ফণিভূষণ, এবং শ্যালীর দুটি ছেলে-মেয়ে—সবশুদ্ধ এই পাঁচটি লোককে করালীবাবু প্রতিপালন করতেন।

তারা সবাই এই বাড়ীতেই থাকে। তাদের তিন কুলে আর কেউ নেই।

'যতদূর জানা যায়, করালীবাবু ভয়ঙ্কর কপিশ্ মেজাজের লোক ছিলেন। বাতব্যাধিতে পঙ্গু ছিলেন, বয়সও ষাট-বাষট্টি হয়েছিল—তাই নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ লোক তাঁকে বাঘের মতন ভয় করত। তাঁর এক অদ্ভুত পাগলামি ছিল—তিনি কেবলই নিজের উইল তৈরী করতেন। তাঁর তিনখানা উইল দেরাজ থেকে বেরিয়েছে। প্রথমটায় তিনি ফণীকে ওয়ারিশ ক'রে যান, দ্বিতীয়টার ওয়ারিস মতিলাল, এবং সবশেষটায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দিয়ে গেছেন। শেষ উইলটা তৈরী হয়েছে—পরশু। সুকুমারই এখন তাঁর ওয়ারিস।

'করালীবাবুর থেকে থেকে উইল বদ্‌লাবার কারণ ছিল এই যে, যখন যার ওপর তিনি চটতেন, তখনই তাকে উইল থেকে খারিজ ক'রে দিতেন।

'এই উইলের ব্যাপার নিয়ে কালদুপুর-বেলা মতিলালের সঙ্গে করালী-বাবুর খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যায়। মতিলালের শরীরে অনেক দোষ আছে—সে তাঁকে "ঘাটের মড়া" "বাহাত্তুরে বুড়ো" ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে চ'লে আসে।'

'তার পর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় মতিলাল চুপিচুপি বাড়ী থেকে পলায়—বামুন এবং চাকর দু'জনেই তাকে পলাতে দেখেছে। আজ সকাল-বেলা দেখা গেল, করালীবাবু তাঁর বিছানায় ম'রে প'ড়ে আছেন।

'কি ক'রে মৃত্যু হ'ল, প্রথমটা কেউ বুঝতে পারে নি। আমি এসে

বার করলুম—তাঁর ঘাড়ে, ঠিক মেডালা আর ফার্ষ্ট ভার্টিব্রা'র মাঝখানে একটা ছুঁচ আমূল ফুটিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

বিধুবাবু চুপ করিলে ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! মেডালা আর ফার্ষ্ট সার্ভিক্ল ভার্টিব্রা'র সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে খুন করেছে, এ যে একেবারে Bride of Lammermoor! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, 'মতিলালের নামে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে দিয়েছেন? লোকটা কাজকর্ম্ম কিছু করে কি না, খবর পাওয়া গেছে কি?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'কিছু না—কিছু না! থার্ড ক্লাস অবধি বিদ্যে, ঘোর বয়াটে। মামার অন্ন মারত, আর বেলেল্লাগিরি ক'রে বেড়াত।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আর মাখনলাল?'

'তিনিও প্রায় দাদার মত, তবে অতটা নয়। কোকেন, গাঁজা-টাজা খায় বটে, কিন্তু দাদার মত এখনও নাম-কাটা সেপাই হয়ে ওঠে নি।'

'আর ফণিভূষণ?'

'তিনি আবার খোঁড়া। কথায় বলে—কাণা-খোঁড়ার এক গুণ বাড়া, কিন্তু এ ছোঁড়া বোধ হয় অতটা খারাপ নয়। তার কারণ, খোঁড়া ব'লে বাড়ী থেকে বেরুতে পারে না। তিন ভায়ের মধ্যে এই ফণিভূষণই একটু মানুষের মত বোধ হ'ল।'

'আর সুকুমার?'

'সুকুমার বেশ ভাল ছেলে; মেডিক্যাল কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। তার বোন সত্যবতীও কলেজে পড়ে। এরা দুই ভাই-বোনে বুড়োর যা কিছু সেবা-শুশ্রূষা করত।'

'এরা সকলেই বোধ হয় অবিবাহিত?'

'হ্যাঁ—মেয়েটিও।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এবার চলুন, বাড়ীটা একবার ঘুরে দেখা যাক। মৃতদেহ বোধ হয় এখনও স্থানান্তরিত হয় নি।'

'না।' একটু অপ্রসন্নভাবেই বিধুবাবু উঠিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বারান্দার দুই দিক হইতে উঠিয়া মাঝে চওড়া হইয়া দ্বিতলে পৌঁছিয়াছে। সিঁড়ির নীচের একটি ঘরের দরজা দেখা গেল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও ঘরটি কার?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'ওটা মতিলালের ঘর। বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি নীচে শোয়াই পছন্দ করতেন। কর্ত্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, রাত্রি নটার পর কারুর বাইরে থাকবার হুকুম ছিল না। এর ঠিক ওপরের ঘরেই কর্ত্তা শুতেন।'

'ও—আর এ ঘরটি?' বলিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির পাশে কোণের ঘরটি নির্দ্দেশ করিল।

'ওটায় মাখনলাল থাকে।'

'এরা সবাই যে যার ঘরেই আছেন বোধ হয়? অবশ্য মতিলাল ছাড়া?'

'নিশ্চয়। আমি কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছি, আমার বিনা অনুমতিতে কেউ যেন বাড়ীর বাইরে না যায়। দোরের কাছে কনৃষ্টেবল মোতায়েন আছে।'

ব্যোমকেশ অস্ফুট স্বরে প্রশংসা ও অনুমোদনসূচক কি একটা বলিল, শুনা গেল না। দোতলায় উঠিয়া সম্মুখেই একটা বন্ধ দরজা দেখাইয়া বিধুবাবু বলিলেন, 'এই ঘরে করালীবাবু শুতেন।'

দরজার সম্মুখে গিয়া হঠাৎ ব্যোমকেশ নতজানু হইয়া ঝুঁকিয়া বলিল, 'এটা কিসের দাগ ?'

বিধুবাবুও ঝুকিয়া একবার দেখিলেন, তার পর সোজা হইয়া তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, 'ও চায়ের দাগ। প্রত্যহ সকালে ঐ মেয়েটি—সত্যবতী—চা তৈরী ক'রে এনে করালীবাবুকে ডাকত—আজ সকালে সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, তিনি ম'রে প'ড়ে আছেন। সেই সময় বোধ হয়, পেয়ালা থেকে চা চল্‌কে পড়েছিল।'

'ও—তিনিই বুঝি সর্ব্বপ্রথম করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জান্‌তে পারেন ?'

'হাঁ।'

দ্বারে চাবি লাগানো ছিল, বিধুবাবু তালা খুলিয়া দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি মাঝারি আয়তনের, আসবাবপত্র বেশী নাই, কিন্তু যে কয়টি আছে, সেগুলি পরিপাটীভাবে সাজানো। মেঝেয় মৃজাপুরী কার্পেট পাতা ; ঘরের মাঝখানে কাজ করা টেবল-ক্লথে ঢাকা ছোট টিপাই ; এক কোণে একটি আলনা—তাহাতে কোঁচানো থান ও জামা গোছানো রহিয়াছে, জুতাগুলি নীচে বার্ণিশ করা অবস্থায় সারি সারি রাখা আছে। ঘরের বাঁ দিকের কোণে একখানি খাট—খাটের উপর চাদর-ঢাকা একটা বস্তু রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ পাশ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। খাটের পাশে একটি টেবল, তাহার উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ও মেজার গ্লাস সারি দিয়া সাজানো রহিয়াছে। কাচের গেলাস ঢাকা একটি কুঁজা খাটের শিয়রে মেঝের উপর রাখা আছে। মোটের উপর ঘরটি দেখিলে গৃহকর্ত্তা যে কিরূপ গোছালো লোক ছিলেন, তাহা

সহজেই অনুমান করা যায়, এবং বিছানায় শয়ান ঐ চাদর-ঢাকা লোকটি যে গত রাত্রিতে এই ঘরেই খুন হইয়াছে, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

টিপাইয়ের উপর এক পেয়ালা অনাস্বাদিত চা তখনও রাখা ছিল, ব্যোমকেশ প্রথমে সেই পেয়ালাটাই অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিল। শেষে মৃদুস্বরে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'পেয়ালার অর্দ্ধেক চা চল্কে পিরিচে পড়েছে, পেয়ালাটা অর্দ্ধেক খালি, পিরিচটা ভরা—কেন ?'

বিধুবাবু অধীরভাবে মুখের একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, 'সে কথা ত আগেই বলেছি, মেয়েটি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনেছি। কিন্তু কেন ?'

বিধুবাবু এই অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না, বিরক্তমুখে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। চায়ের উপর একটা শ্বেতাভ ছালি পড়িয়াছিল, চামচে দিয়া চা নাড়িয়া সে আস্তে আস্তে একটু চা মুখে দিল। তার পর পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ মুছিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বিছানার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃতদেহ নাড়া-চাড়া হয় নি ? ঠিক যেমন ছিল, তেমনি আছে ?'

বিধুবাবু জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিলেন, 'হুঁ। কেবল চাদরটা মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ছুঁচটা বার ক'রে নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে চাদরটি তুলিয়া লইল। শুষ্ক শীর্ণ লোকটি, যেন দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেছে। মাথার চুল সব পাকিয়া

যায় নাই, কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া কয়েকটা গভীর রেখা পড়িয়াছে। মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নাই।

ব্যোমকেশ লাস না সরাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। ঘাড়ের চুল সরাইয়া দেখিল, নাকের কাছে ঝুঁকিয়া অনেকক্ষণ কি নিরীক্ষণ করিল। তার পর বিধুবাবুকে ডাকিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চয় খুব ভাল করেই লাস পরীক্ষা করেছেন, তবু দুটো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফোটানোর দাগ আছে।

বিধুবাবু পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এখন তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ—কিন্তু ও বিশেষ কিছু নয়। মেডালা আর মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থলটা খুঁজে পায় নি, তাই কয়েকবার ছুঁচ ফুটিয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি কি?'

'নাকটা দেখেছেন?'

'নাক?'

'হ্যাঁ—নাক।'

বিধুবাবু নাক দেখিলেন। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম, নাসারন্ধ্রের চারিদিকে কয়েকটা ছোট ছোট কালো দাগ রহিয়াছে, শীতের সময় গায়ের চামড়া ফাটিয়া যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ।

বিধুবাবু বলিলেন, 'বোধ হয় সর্দ্দি হয়েছিল। ঘন ঘন নাক মুছলে ওরকম দাগ হয়। এ থেকে আপনি কি অনুমান করলেন?' বিধু-বাবুর স্বর বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ।

'কিছু না—কিছু না। চলুন, এবার পাশের ঘরটা দেখা যাক। ওটা বোধ হয়, করালীবাবুর বসবার ঘর ছিল।'

পাশের ঘরে টেবল, চেয়ার, বইয়ের আলমারী ইত্যাদি ছিল—এই ঘরেই করালীবাবু অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। বিধুবাবু টেবলের

দেরাজ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই দেরাজে তাঁর উইলগুলো পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ এ ঘরটাও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। দেরাজেও অন্য কোনও কাগজপত্র ছিল না। ঘরের অপর দিকে ছোট একটি গোসলখানা—ব্যোমকেশ সেটাতে একবার উঁকি মারিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'এখানে আর কিছু দেখবার নেই। এবার চলুন সুকুমারবাবুর ঘরে—তিনি মৃতের উত্তরাধিকারী না? ভাল কথা, ছুঁচটা একবার দেখি।'

বিধুবাবু পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশ তাহার ভিতর হইতে একটি ছুঁচ বাহির করিয়া দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিল। সাধারণ ছুঁচ অপেক্ষা আকারে একটু বড় ও মোটা—অনেকটা কাঁথা-সেলাইয়ের ছুঁচের মত; তাহার প্রান্ত হইতে একটু সূতা ঝুলিতেছে।

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত-নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চাপা-স্বরে কহিল, 'আশ্চর্য্য! ভারি আশ্চর্য্য!'

'কি?'

'সুতো। দেখছেন না, ছুঁচে সুতো পরানো রয়েছে—কালো রেশমের সুতো!'

'তা ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছুঁচে সুতো পরানো থাকাতে আশ্চর্য্যটা কি?'

ব্যোমকেশ একবার বিধুবাবুর মুখের দিকে তাকাইল, তার পর যেন একটু লজ্জিতভাবে বলিল, 'তাও ত বটে, আশ্চর্য্য হবার কি আছে! ছুঁচে সুতো পরানো ত হয়েই থাকে, সেই জন্যেই ত ছুঁচের সৃষ্টি!' ছুঁচ

খামে রাখিয়া বিধুবাবুকে ফেরৎ দিল, বলিল, 'চলুন, এবার সুকুমার-বাবুকে দেখা যাক।'

বারান্দার বাঁ দিকের মোড় ঘুরিয়া কোণের ঘরটা সুকুমারবাবুর। দ্বার ভেজানো ছিল, বিধুবাবু নিঃসংশয়ে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমার টেবলের উপর কনুই রাখিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, আমরা ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের এক ধারে খাট, অপর ধারে টেবল, চেয়ার ও বইয়ের আলমারী। কয়েকটা তোরঙ্গ দেয়ালের এক ধারে উপরি উপরি করিয়া রাখা আছে।

সুকুমারের বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ হইবে; চেহারাও বেশ ভাল, ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ গোছের দেহ। কিন্তু বাড়ীতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ফলে মুখ শুকাইয়া, চোখ বসিয়া গিয়া চেহারা অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল।

বিধুবাবু বলিলেন, 'সুকুমারবাবু, ইনি—ব্যোমকেশ বক্সী—আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।'

সুকুমার গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বসুন।'

ব্যোমকেশ টেবলের সম্মুখে বসিল। একখানা বই টেবলের উপব রাখা ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'আপনি কাল রাত বারোটার সময় কোথা থেকে ফিরেছিলেন সুকুমারবাবু?'

সুকুমার চমকিয়া উঠিল, তার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'সিনেমায় গিয়েছিলুম।'

ব্যোমকেশ মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ সিনেমায় ?'

'চিত্রা।'

বিধুবাবু একটু ধমকের সুরে বলিলেন, 'এ আমাকে আগে বলা উচিত ছিল। বলেন নি কেন ?'

সুকুমার আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'দরকারী কথা ব'লে মনে হয় নি, তাই বলি নি—'

বিধুবাবু গম্ভীর-মুখে বলিলেন, 'দরকারী কি অদরকারী, সে বিচার আমরা করব। আপনি যে চিত্রায় গিয়েছিলেন, তার কোনও প্রমাণ আছে ?'

সুকুমার কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তার পর আল্‌নায় টাঙানো পাঞ্জাবীর পকেট হইতে একখণ্ড রঙীন কাগজ আনিয়া দেখাইল। কাগজখানা সিনেমা টিকিটের অর্দ্ধাংশ, বিধুবাবু সেটা ভাল করিয়া দেখিয়া নোটবুকের মধ্যে রাখিলেন।

ব্যোমকেশ বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'সন্ধ্যের 'শো'তে না গিয়ে সাড়ে নটার 'শো'তে গিয়েছিলেন—এর কোনও কারণ ছিল কি ?'

সুকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না, কারণ এমন কিছু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে থাকা করালীবাবু পছন্দ করেন না, এ কথা নিশ্চয় আপনার জানা ছিল ?'

সুকুমার উত্তর দিতে পারিল না, পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালীবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন্ হয়েছিল ?'

একটা ঢোঁক গিলিয়া সুকুমার কহিল, 'সন্ধ্যে পাঁচটার সময়।'

'আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

সুকুমার জোর করিয়া নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'মেসোমশাইকে উইল সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েছিলুম। তিনি মতি-দাদাকে বঞ্চিত ক'রে আমার নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেছিলেন; এই নিয়ে মতিদার সঙ্গে দুপুর-বেলা তাঁর বচসা হয়। আমি মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলুম যে, আমি একা তাঁর সম্পত্তি চাই না, তিনি যেন তাঁর সম্পত্তি সবাইকে সমান ভাগ ক'রে দেন।'

'তার পর ?'

'আমার কথা শুনে তিনি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন ?'

'আপনিও বোধ হয় গেলেন।'

'হ্যাঁ। সেখান থেকে আমি ফণীর ঘরে গিয়ে বসলুম। ফণীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাত হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলুম, বায়স্কোপ দেখে আসি; ফণীও যেতে বললে। তাই রাত্রে চুপি চুপি গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, মেসোমশাই জানতে পারবেন না।'

সুকুমারের কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিধুবাবু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। ব্যোমকেশের মুখ কিন্তু নির্ব্বিকার হইয়া রহিল। বিধু-বাবু বেশ একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, 'আপনার মনের কথা কি বলুন ত ব্যোমকেশবাবু ? আপনি কি সুকুমারবাবুকে খুনী ব'লে সন্দেহ করেন ?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না, না, সে কি কথা—চলুন, এবার এঁর ভগিনীর ঘরটা—'

বিধুবাবু অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলিলেন, 'চলুন। কিন্তু অযথা একটি মেয়েকে উত্যক্ত করবার কোনো দরকার ছিল না, সে কিছু জানে না। তাকে যা জিজ্ঞাসা করবার, আমি জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, 'সে ত নিশ্চয়। তবু একবার—'

বারান্দা যেখানে মোড় ফিরিয়াছে, সেই কোণের উপর মেয়েটির ঘর; বিধুবাবু গিয়া দরজায় টোকা মারিলেন। আধ মিনিট পরে একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে দরজা খুলিয়া আমাদের দেখিয়া কবাটের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা সঙ্কুচিত-পদে ঘরে প্রবেশ করিলাম। সুকুমারও আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে গিয়া ক্লান্তভাবে বিছানায় বসিয়া পড়িল।

ঘরে ঢুকিবার সময় মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইয়াছিলাম। তাহার গায়ের রঙ্ ময়লা, লম্বা রোগা গোছের চেহারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখও ঈষৎ ফুলিয়াছে; সুতরাং সে সুশ্রী কি কুশ্রী, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মাথার চুল রুক্ষ। এই শোকে অবসন্ন মেয়েটিকে জেরা করার নিষ্ঠুরতার জন্য মনে মনে ব্যোমকেশের উপর রাগ হইতেছিল, কিন্তু তাহার কুণ্ঠার আড়ালে যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ মেয়েটিকে একটি নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'আপনাকে একটু কষ্ট দেব, কিছু মনে করবেন না। এ রকম একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা যখন বাড়ীতে হয়ে যায়, তখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত পুলিশের ছোট-খাট উৎপাতও সহ্য করতে হয়—'

বিধুবাবু ফোঁস করিয়া উঠিলেন, 'পুলিসের নামে বদ্‌নাম দেবেন না, আপনি পুলিস নন্।'

ব্যোমকেশ সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'বেশী নয়, দু' একটা সাধারণ প্রশ্ন আপনাকে করব। বসুন।' বলিয়া ঘরের একটিমাত্র চেয়ার নির্দ্দেশ করিল।

মেয়েটি বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। তার পর চাপা ভাঙা গলায বলিল, 'আপনি কি জানতে চান, বলুন। আমি দাঁড়িয়েই জবাব দিচ্ছি।'

'বসবেন না ? আচ্ছা,আমিই তা হ'লে বসি।' চেয়ারে বসিয়া ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। এ ঘরটিও সুকুমারের ঘরের মত অত্যন্ত সাদাসিধা—আস্‌বাবের বাহুল্য নাই। খাট, টেবল, চেয়ার, বইয়ের আলমারী ; বাড়্‌তির মধ্যে একটা দেরাজযুক্ত ড্রেসিং টেবল।

কড়িকাঠের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই রোজ সকালে চা নিয়ে করালীবাবুকে ডাক্‌তেন ?'

মেয়েটি নীরবে ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ তা হ'লে চা দিতে গিয়েই আপনি প্রথম জান্‌তে পারলেন যে, তিনি মারা গেছেন ?'

মেয়েটি আবার ঘাড় নাড়িল।

'তার আগে আপনি কিছু জানতেন না ?'

বিধুবাবু গলার মধ্যে গজ্‌ গজ্‌ করিয়া বলিলেন, 'বাজে প্রশ্ন, বাজে প্রশ্ন। একেবারে foolish !'

ব্যোমকেশ যেন শুনিতে পায নাই, এমনই ভাবে বলিল, 'রাত্রিতে করালীবাবুর দরজা খোলা থাকত ?'

'হ্যাঁ। এ বাড়ীর কারুর দরজা বন্ধ ক'রে শোবার হুকুম ছিল না। মেসোমশাই নিজেও রাত্রিতে দরজা খুলে শুতেন।'

'বটে! তা হ'লে—'

বিধুবাবু আর যেন সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঢের হয়েছে, এবার উঠুন। যত সব বাজে প্রশ্ন ক'রে বেচারীকে বিরক্ত করবার দরকার নেই। আপনি ক্রস্ একজামিন করতে জানেন না—'

এতক্ষণে ব্যোমকেশের বিনীতভাবের মুখোস খসিয়া পড়িল। খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত সে বিধুবাবুর দিকে ফিরিয়া তীব্র অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'যদি বার বার বিরক্ত করেন, তা হ'লে আমি কমিশনার সাহেবকে জানাতে বাধ্য হ'ব যে, আপনি আমার অনুসন্ধানে বাধা দিচ্ছেন। আপনি জানেন, এ ধরণের কেস্ সাধারণ পুলিসের এলাকায় পড়ে না—এটা সি আই ডি'র কেস?'

গালে চড় খাইলেও বোধ করি বিধুবাবু এত স্তম্ভিত হইতেন না। তিনি আরক্ত-চক্ষুতে কটমট্ করিয়া কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া রহিলেন। তার পর একটা অর্দ্ধোচ্চারিত কথা গিলিয়া ফেলিয়া গট গট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনি করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতেন না?'

'ভেবে দেখেছি, জানতুম না।' মেয়েটির গলার আওয়াজে একটু জিদের আভাস পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল, 'যাক। এখন আর একটা কথা বলুন ত, করালীবাবু চায়ে ক' চামচ চিনি খেতেন?'

মেয়েটি এবার অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'চিনি? মেসোমশাই চায়ে চিনি একটু বেশী খেতেন, তিন-চার চামচ দিতে হ'ত—'

বন্দুকের গুলীর মত প্রশ্ন হইল, 'তবে আজ তাঁর চায়ে আপনি চিনি দেন নি কেন?'

মেয়েটির মুখ একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল, ত্রাস-বিস্ফারিত নয়নে সে একবার চারিদিকে চাহিল। তার পর অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, 'বোধ হয়, মনে ছিল না, কাল থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই—'

'কাল কলেজে গিয়েছিলেন?'

অস্পষ্ট অথচ বিদ্রোহপূর্ণ উত্তর হইল, 'হ্যাঁ।'

অলসভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সব কথা খুলে বললে আমাদের অনেক সুবিধা হয়, আপনাদেরও হয় ত সুবিধা হ'তে পারে!'

মেয়েটি ঠোঁট টিপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'সব কথা বলবেন কি?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে কাটিয়া কাটিয়া বলিল, 'আমি আর কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ সে টেবলের উপর রক্ষিত একটা শেলায়ের বাক্সের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল, এবার টেবলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বাক্সটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'এটা আপনার বোধ হয়?'

'হ্যাঁ।'

বাক্সটা ব্যোমকেশ খুলিল। বাক্সর মধ্যে একটা অসমাপ্ত টেবল ক্লথ ও নানা রঙের রেশমী সূতা তাল পাকানো ছিল। সূতার তালটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ নিজমনেই বলিতে লাগিল, 'লাল, বেগুনী, নীল, কালো

—হুঁ—কালো—' সূতা রাখিয়া দিয়া বাক্সের মধ্যে কি খুঁজিল, পাট-করা টেবল-ক্লথটা খুলিয়া দেখিল; তার পর মেয়েটির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ছুঁচ কই?'

মেয়েটি একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'ছুঁচ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—ছুঁচ। ছুঁচ দিয়েই শেলাই করেন নিশ্চয়। সে ছুঁচ কোথায়?'

মেয়েটি কি বলিতে গেল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না; হঠাৎ ফিরিয়া 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সুকুমার যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাপা কান্নার আবেগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সুকুমার বিহ্বলের মত তাহার মুখটা তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'সত্য—সত্য—?'

সত্যবতী মুখ তুলিল না, কাঁদিতেই লাগিল। ব্যোমকেশ তাহাদের নিকটে গিয়া খুব নরম সুরে বলিল, 'ভাল করলেন না, আমাকে বললে পারতেন। আমি পুলিস নই—শুনেছেন ত। বললে হয় ত আপনাদের সুবিধা হ'ত।—চল অজিত।'

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে দ্বার ভেজাইয়া দিল; কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, 'এবার?—হ্যাঁ—ফণীবাবু। চল, বোধ হয়, ওদিকের ঘরটা তাঁর।'

করালীবাবুর ঘর পার হইয়া বারান্দার অপর প্রান্তের মোড় ঘুরিয়া পাশেই একটা দরজা পড়ে, ব্যোমকেশ তাহাতে টোকা মারিল।

একটি একুশ-বাইশ বছর বয়সের ছোকরা দরজা খুলিয়া দিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ফণীবাবু?'

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ—আসুন।'

ফণীর চেহারা দেখিয়াই মনে হয়, তাহার শরীরে কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে; কিন্তু সহসা ধরা যায় না। তাহার দেহ বেশ পুষ্ট, কিন্তু মুখখানা হাড় বাহির করা; বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনা যেন অল্পবয়সেই তাহার মুখখানাকে রেখা-চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতেই সে আগে আগে গিয়া একটা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া দিযা বলিল, 'বসুন।' তখন তাহার হাঁটার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, শারীরিক অসঙ্গতিটা কোন্‌খানে। তাহার বাঁ পা'টা অস্বাভাবিক সরু—চলিত কথায় যাহাকে 'ছিনে-পড়া' বলে, তাই। ফলে, হাঁটিবার সময় সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে।

আমি বিছানার এক পাশে বসিলাম, ফণী আমার পাশে বসিল। ব্যোমকেশ প্রথমটা যেন কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, শেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'এই ব্যাপারে পুলিস আপনার দাদা মতিলাল-বাবুকে সন্দেহ করে, আপনি জানেন বোধ হয়?'

ফণী বলিল, 'জানি; কিন্তু আমিও জোর ক'রে বলতে পারি যে, দাদা নির্দ্দোষ। দাদা ভয়ানক রাগী আর ঝগ্‌ড়াটে—কিন্তু সে মামাকে খুন করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষয় থেকে বঞ্চিত হবার রাগে তিনি এ কাজ করতে পারেন না কি?'

ফণী বলিল, 'সে অজুহাত শুধু দাদার নয়, আমাদের তিন ভায়েরই আছে। তবে শুধু দাদাকেই সন্দেহ করবেন কেন?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'আপনি যা জানেন, সব কথাই বোধ হয় পুলিসকে বলেছেন, তবু দু' একটা কথা জানতে চাই—'

ফণী একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আপনি কি পুলিসের লোক নন? আমি ভেবেছিলুম, আপনারা সি আই ডি—'

ব্যোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আমি একজন সামান্য সত্যান্বেষী মাত্র—'

বিস্ফারিত-চক্ষে ফণী বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'এখন বলুন ত, করালীবাবুর সঙ্গে বাড়ীর আর সকলের সম্বন্ধটা কি রকম ছিল? অর্থাৎ তিনি কাকে বেশী ভালবাসতেন কাকে অপছন্দ করতেন—এই সব।'

ফণী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'দেখুন, আমি খোঁড়া মানুষ—ভগবান আমাকে মেরেছেন —তাই আমি ছেলেবেলা থেকে কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে মিশ্‌তে পারি না। এই ঘর আর এই বইগুলো আমার জীবনের সঙ্গী (বিছানার পাশে একটা বইয়ের শেল্‌ফ দেখাইল)—মামা যে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কাকে বেশী ভালবাসতেন, তা নির্ভুলভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বড় তিরিক্ষি মেজাজের লোক ছিলেন, তাঁর মনের ভাব মুখের কথায় প্রকাশ পেত না। তবে আঁচে-আন্দাজে যতদূর বোঝা যায়, সত্যবতীকেই মনে মনে ভালবাসতেন।'

'আর আপনাকে?'

'আমাকে—আমি খোঁড়া অকর্ম্মণ্য ব'লে হয় ত ভেতরে ভেতরে একটু

দয়া করতেন—কিন্তু তার বেশী কিছু—। আমি মৃতের অমর্য্যাদা করছি না, বিশেষতঃ তিনি আমাদের অন্নদাতা, তিনি না আশ্রয় দিলে আমি না খেতে পেয়ে ম'রে যেতুম, কিন্তু মামার শরীরে প্রকৃত ভালবাসা বোধ হয় ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি সুকুমারবাবুকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, জানেন বোধ হয় ?'

ফণী একটু হাসিল—শুনেছি। সুকুমারদা সব দিক থেকেই যোগ্য লোক, কিন্তু ও-থেকে মামার মনের ভাব কিছু বোঝা যায় না। তিনি আশ্চর্য্য খেয়ালী লোক ছিলেন ; যখনই কারুর ওপর রাগ হ'ত, তখনই উইল বদলে ফেলতেন। বোধ হয়, এ বাড়ীতে এমন কেউ নেই—যার নামে একবার মামা উইল তৈরী না করেছেন। আমিও একবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলুম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষ উইল যখন সুকুমারবাবুর নামে, তখন তিনিই সম্পত্তি পাবেন।'

ফণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আইনে কি তাই বলে ? আমি ঠিক জানি না।'

'আইনে তাই বলে।' ব্যোমকেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ অবস্থায় আপনি কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন কি ?'

ফণী চুলের মধ্যে একবার আঙ্গুল চালাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিল, 'কি করব, কোথায় যাব, কিছুই জানি না। লেখাপড়া শিখি নি, উপার্জ্জন করবার যোগ্যতা নেই। সুকুমারদা যদি আশ্রয় দেয়, তবে তার আশ্রয়েই থাকব—না হয়, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।' তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'সুকুমারবাবু কাল রাত্রি বারোটার সময় বাড়ী ফিরেছেন।'

ফণী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—'রাত্রি বারোটার সময়! ওঃ হ্যাঁ, তিনি বায়স্কোপে গিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালীবাবুকে কটার সময় খুন করা হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পারেন? কোনও রকম শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন কি?'

'কিছু না। হয় ত শেষ রাত্রে—'

'উঁহু—তিনি রাত্রি বারোটার সময় খুন হয়েছেন।' ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, ঘড়ী দেখিয়া বলিল, 'উঃ, আড়াইটে বেজে গিয়েছে—আর না, চল হে অজিত। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে—আপনাদেরও ত এখনও খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নি—নমস্কার!'

এমন সময় নীচে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল; পরক্ষণেই আমাদের ঘরের দরজা সজোরে ঠেলিয়া একজন লোক উত্তেজিতভাবে বলিতে বলিতে ঢুকিল, 'ফণি, দাদাকে অ্যারেষ্ট ক'রে এনেছে—' আমাদের দেখিয়াই সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মাখনবাবু?'

মাখন ভয়ে কুঁচ্‌কাইয়া গিয়া 'আমি—আমি কিছু জানি না। বলিয়া সবেগে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

নীচে নামিয়া গিয়া দেখিলাম, বসিবার ঘরে হুলস্থূল কাণ্ড। বিধুবাবু ঘরে নাই, থানার ইনস্পেক্টর তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। একটা পাগলের মত চেহারার হাতকড়া-পরা লোককে দু'জন কনষ্টেবল

ধরিয়া আছে আর সে হাউ-মাউ করিয়া বলিতেছে, 'মামা খুন হয়েছেন? দোহাই মশাই, আমি কিছু জানি না—যে দিব্যি গালতে বলেন গালছি—আমি মাতাল-দাঁতাল লোক—ডালিমের বাড়ীতে রাত কাটিয়েছি—ডালিম সাক্ষী আছে—'

ইনস্পেক্টরবাবুটি সত্যসত্যই কাজের লোক, এতক্ষণ নিস্পৃহভাবে বসিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, ইনিই মতিলাল—বিধুবাবুর আসামী। যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।'

ব্যোমকেশবাবু বলিল, 'কোথায় একে গ্রেপ্তার করা হ'ল?'

যে সব্-ইনস্পেক্টারটি গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সে বলিল, 'হাড়কাটা গলির এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে—'

মতিলাল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ডালিমের বাড়ীতে ঘুমুচ্ছিলুম—কোন্ শালা মিছে কথা বলে—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, 'আপনি ত ভোর না হতেই বাড়ী ফিরে আসেন, আজ ফেরেন নি কেন?'

পাগলের মত আরক্ত-চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া মতিলাল বলিল, 'কেন? কেন? আমি—আমি মদ খেয়েছিলুম—দু'বোতল হুইস্কি টেনেছিলুম—ঘুম ভাঙে নি—'

ব্যোমকেশ ইনস্পেক্টরবাবুর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল, তিনি বললেন, 'নিয়ে যাও—হাজতে রাখো—'

মতিলাল চীৎকার করিতে করিতে স্থানান্তরিত হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'বিধুবাবু কোথায়?'

'তিনি মিনিট-পনের হ'ল বাড়ী গেছেন—আবার চারটের সময় আসবেন।'

'আচ্ছা, তা হ'লে আমরাও উঠি, কাল সকালে আবার আসব। ভাল কথা, বাড়ীর ঘরগুলো সব খানাতল্লাস হয়েছে?'

'করালীবাবুর আর মতিলালের ঘর খানাতল্লাস হয়েছে, অন্য ঘরগুলো খানাতল্লাস করা বিধুবাবু দরকার মনে করেন নি।'

'মতিলালের ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে?'

'কিছু না।'

'উইলগুলো দেখা হ'ল না, সেগুলো বোধ হয় বিধুবাবু শীল ক'রে রেখে গেছেন। থাক, কাল দেখলেই হবে। আচ্ছা, চললুম। ইতিমধ্যে যদি নূতন কিছু জানতে পারেন, খবর দেবেন।'

বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে করালীবাবুর বাড়ীর একটা নক্সা তৈয়ার করিয়া ব্যোমকেশ আমাকে দেখাইল, বলিল, 'করালীবাবুর ঘরের নীচে মতিলালের ঘর; মাখনের ঘর তার পাশে। ফণীর ঘরের নীচে বৈঠকখানাঘর অর্থাৎ যেখানে পুলিস আড্ডা গেড়েছে। সত্যবতীর ঘরের নীচে রান্নাঘর, আর সুকুমারের ঘরের নীচের ঘরে চাকর বামুন শোয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ প্ল্যান্ কি হবে?'

'কিছু না। বলিয়া ব্যোমকেশ নক্সাটা মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'তোমার কি রকম মনে হচ্ছে? মতিলাল বোধ হয় খুন করে নি—না?'

'না—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'তবে কে?'

'সেইটে বলাই শক্ত। মতিলালকে বাদ দিলে চারজন বাকী থেকে

যায়—ফণী, মাখন, সুকুমার আর সত্যবতী। এদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে। সকলের স্বার্থ প্রায় সমান।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'সত্যবতীও ?'

'নয় কেন ?'

'কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে—'

'মেয়েমানুষ যাকে ভালবাসে, তার জন্যে করতে পারে না, এমন কাজ নেই।'

'কিন্তু তার স্বার্থ কি ? করালীবাবুর শেষ উইলে তার ভাই-ই ত সব পেয়েছে।'

'বুঝলে না ? যে লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদলায়, তাকে খুন করলে আর তার মত বদ্‌লাবার অবকাশ থাকে না।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এ দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। বলিলাম, 'তবে কি তোমার মনে হয়, সত্যবতীই ?'

'আমি তা বলি নি। সুকুমার হ'তে পারে, সম্পূর্ণ বাইরের লোকও হ'তে পারে। কিন্তু সত্যবতী মেয়েটা সাধারণ মেয়ে নয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত প্রকার খাপছাড়া ও পরস্পর-বিরোধী মালমশ্‌লা আমাদের হস্তগত হইয়াছিল যে, তাহার ভিতর হইতে সুসংলগ্ন একটা কিছু বাছিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা এতই জটিল যে, ভাবিতে গেলে আরও জট পাকাইয়া যায়।

শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মৃতদেহ দেখে তুমি কি বুঝলে ?'

'এই বুঝলুম যে, হত্যা করবার আগে হত্যাকারী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম্ম করেছিল।'

'কি ক'রে বুঝ্‌লে ?'

'তাঁর ঘাড়ে হত্যাকারী তিনবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল। ক্লোরোফর্ম্ম না করলে তিনি জেগে উঠ্‌তেন।'

'তিনবার ছুঁচ ফোটাবার মানে ?'

'মানে, প্রথম দু'বার মর্ম্মস্থানটা খুঁজে পায় নি। কিন্তু সেটা তেমন জরুরী কথা নয় ; জরুরী কথা হচ্ছে এই যে, ছুঁচটা বিঁধিয়ে রেখে গেল কেন ? কাজ হয়ে গেলে বার ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেই ত আর কোনও প্রমাণ থাকত না।'

'হয় ত তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথা—রাত বারোটার সময় খুন হয়েছে, তুমি বুঝলে কি ক'রে ?'

'ওটা আমার অনুমান। কিন্তু সত্যবতী যদি কখনও সত্যি কথা বলে, দেখবে, আমার অনুমান ঠিক। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকেও জানা যাবে।'

কিছুক্ষণ উর্দ্ধমুখে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সুকুমারের টেবলের ওপর একখানা বই রাখা ছিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। সারা বইয়ের মধ্যে কেবল একটা পাতায় কয়েক লাইন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া ছিল।'

'সে কয় লাইনের অর্থ ?'

'অর্থ—মেডালা এবং প্রথম কশেরুর সন্ধিস্থলে যদি ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।'

আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'বল কি ! তা হ'লে ?'

'কিন্তু আশ্চর্য্য ! লাল পেন্সিলটা সুকুমারের টেবলে দেখলুম না।' বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গভীর চিন্তাক্রান্তমুখে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। আমার মনের মধ্যে অনেকগুলা প্রশ্ন গজ্ গজ্ করিতেছিল,

কিন্তু ব্যোমকেশের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করিতে ভরসা হইল না। জানিতাম, এই সময় প্রশ্ন করিলেই সে খেঁকী হইয়া উঠে।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে একটা প্রশ্ন করিল, 'তুমি ত একজন সাহিত্যিক, বল দেখি thimbleএর বাঙ্‌লা কি ?'

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'Thimble ? যা আঙুলে প'রে দর্জ্জিরা শেলাই করে ?'

'হ্যাঁ।'

আমি ভাবিতে ভাবিতে বলিলাম, 'অঙ্গুলীত্রাণ হ'তে পাবে—কিম্বা —সূচীবর্ম্ম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওসব চালাকি চল্‌বে না, খাঁটি বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ বল।'

স্বীকার করিতে হইল, বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ নাই, অন্ততঃ আমার জানা নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি জানো ?'

'উঁহু। জানলে আর জিজ্ঞাসা করব কেন ?'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। আমিও বাংলা ভাষার অশেষ দৈন্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছে। একটু রাগ হইল; কিন্তু বুঝিলাম, আমাকে না লইয়া যাওয়ার কোনও মতলব আছে—হয় ত আমি গেলে অসুবিধা হইত।

যখন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা; জামা খুলিয়া পাখাটা চালাইয়া দিয়া সিগারেট ধরাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল ?'

সে একপেট ধোঁয়া টানিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'উইলগুলো দেখা গেল। উইলের সাক্ষী বাড়ীর বামুন আর চাকর—তাদের টিপ্‌সই রয়েছে।'

'আর?'

'বাড়ীর অন্য ঘরগুলো ভাল ক'রে খানাতল্লাস করতে বললুম। কিন্তু বিধুবাবু গোঁ ধরেছেন, আমি যা বলব, তার উল্টো কাজটি করবেন। শেষ পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে এলুম, খানাতল্লাস না করেন, কমিশনার সাহেবকে নালিশ করব।'

'তার পর?'

'তার পর আর কি! তিনি এখনও মতিলালকে কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছেন।' কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মেয়েটা ভয়ানক শক্ত, এমন মুখ টিপে রইল, কিছুতেই মুখ খুললে না! অথচ এ রহস্যের চাবিকাঠি তার কাছে। যা হোক, দেখা যাক, বিধুবাবু যদি শেষ পর্য্যন্ত খানাতল্লাস করা মনস্থ করেন হয় ত কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'কি পাওয়া যাবে, প্রত্যাশা কর?'

'কে বলতে পারে? সামান্য জিনিষ, হয় ত একটা ডাক্তারি দোকানের ক্যাশমেমো কিম্বা একটা পেন্সিল কিম্বা—কিন্তু বৃথা গবেষণা ক'রে লাভ নেই। চল, নাইবার বেলা হ'ল।'

দুপুর-বেলাটা ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া শুইয়া কাটাইয়া দিল; মনে হইল, সে যেন কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনটা বাজিতেই পুঁটিরাম চা দিয়া গেল, নিঃশব্দে পান করিয়া ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিল।

সাড়ে চারটে বাজিবার পর পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দ্রুত উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল, 'কে আপনি?…ও ইন্সপেক্টরবাবু, কি খবর?…সুকুমারবাবুর ঘর সার্চ্চ হয়েছে! বেশ বেশ, বিধুবাবু তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত…তাঁর ঘরে কি পাওয়া গেল?…অ্যাঁ, সুকুমারবাবুকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে! তার পর—কিছু পাওয়া গেল? ক্লোরোফর্ম্মের শিশি…আলমারীতে বযের পেছনে ছিল…আর? উইল! আর একখানা উইল? বলেন কি? কোন্ তারিখের? · যে রাত্রে করালীবাবু মারা যান, সেই দিন তৈরী—হুঁ। কোথায় ছিল? বাক্সের তলায়! এ উইলে ওযারিস কে?·· ফণীবাবু!'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, পর্য্যায়ক্রমে এবার তাঁরই পালা ছিল বটে।·· সুকুমারবাবুর বোনকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?…না…ও—বুঝেছি… ঘরে আর কিছু পাওয়া যায নি? এই ধরুন—একটা লাল পেন্সিল? পান নি? আশ্চর্য্য? শেলাইয়ের কোনও উপকরণ পান নি? তাই ত!…বিধুবাবু আছেন?…মতিলালকে খালাস করতে গেছেন · তবু ভাল, বিধুবাবুর সুমতি হয়েছে। সুকুমারবাবুর ঘর ছাড়া আর কোন্ কোন্ ঘর সার্চ্চ হয়েছে? আর হয নি! কি বললেন, বিধুবাবু দরকার মনে করেন নি! বিধুবাবু ত কিছুই দরকার মনে করেন না। আমার আজ যাবার দরকার আছে কি? নূতন উইলখানা দেখতুম…ও—নিয়ে গেছেন…আচ্ছা—কাল সকালেই হবে। লাল পেনসিল আর ঐ শেলাযের উপকরণটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ—কি বলছেন? সুকুমারের বিরুদ্ধে overwhelming প্রমাণ পাওয়া গেছে? তা বলতে পারেন—কিন্তু—ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া গেছে? মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কি লিখেছেন? আহারের তিন ঘণ্টা পরে·· তার মানে আন্দাজ রাত বারোটা…আচ্ছা, কাল সকালে নিশ্চয় যাব।'…

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার চিন্তা-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুকুমারই তা হ'লে? তুমি ত তাকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে—না?'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এ ব্যাপারের যত কিছু প্রমাণ, সবই সুকুমারের দিকে নির্দ্দেশ করছে। দেখ, করালীবাবুর মৃত্যুর ধরণটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এ ডাক্তারের কাজ। যারা ডাক্তারি কিছু জানে না, তারা ওভাবে খুন করতে পারে না। যে ছুঁচটা ব্যবহার করা হয়েছে, তাও তার বোনের শেলায়ের বাক্স থেকে চুরি করা, এমন কি, সুতোটা পর্য্যন্ত এক। সুকুমার বারোটার সময় বাড়ী ফিরল—ঠিক সেই সময় করালীবাবুও মারা গেলেন। সুকুমারের ঘর সার্চ্চ ক'রে কেবল ক্লোরফর্ম্মের শিশি, আর একটা উইল—করালীবাবুর শেষ উইল, যাতে তিনি সুকুমারকে বঞ্চিত ক'রে ফণীকে সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন। সুকুমার নিজের মুখেই স্বীকার করেছে যে, সে দিন সন্ধ্যাবেলা করালীবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল—সুতরাং তিনি যে আবার উইল বদলাবেন, তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। খুন করবার মোটিভ্ পর্য্যন্ত পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে।'

'তা হ'লে সুকুমারই যে আসামী, তাতে আর সন্দেহ নেই?'

'সন্দেহের অবকাশ কোথায়?' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, সুকুমারকে দেখে তোমার কি রকম মনে হ'ল? খুব নির্ব্বোধ ব'লে মনে হ'ল কি?'

আমি বলিলাম, 'না। বরঞ্চ বেশ বুদ্ধি আছে বলেই মনে হ'ল।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইখানেই ধোঁকা লাগছে। বুদ্ধিমান বোকার মত কাজ করে কেন?'

বলিযাই ব্যোমকেশ সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল। দ্বারের কাছে অস্পষ্ট পদধ্বনি আমিও শুনিতে পাইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'কে? ভিতরে আসুন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তার পর আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া গেল। তখন ঘোর বিস্ময়ে দেখিলাম, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—সত্যবতী!

সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল; কিছুকাল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে বাঁচান।'

অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু তড়াক করিয়া গিয়া সত্যবতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সত্যবতীর মাথাটা বোধ হয় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে অন্ধভাবে একটা হাত বাড়াইয়া দিতেই ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে আনিয়া বসাইয়া দিল। আমাকে ইঙ্গিত করিতেই পাখাটা চালাইয়া দিলাম।

প্রথম মিনিট দুই-তিন সত্যবতী চোখে আঁচল দিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, আমরা নির্ব্বাক লজ্জিত মুখে অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনেও এমন ব্যাপার পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

সত্যবতীকে পূর্ব্বে আমি একবারই দেখিয়াছিলাম; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়ে হইতে সে যে আকারে-প্রকারে একটুও পৃথক্‌, তাহা মনে হয় নাই। সুতরাং ঘোর বিপদের সময় সমস্ত শঙ্কাসঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া

সে যে আমাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারে, ইহা যেমন অচিন্তনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। বিপদ উপস্থিত হইলে অধিকাংশ বাঙালীর মেয়েই জড়বস্তু হইয়া পড়ে। তাই এই কৃশাঙ্গী কালো মেয়েটি আমার চক্ষে যেন সহসা একটা অপূর্ব্ব অসামান্যতা লইয়া দেখা দিল। তাহার পায়ের মলিন জরীর নাগরা হইতে রুক্ষ অযত্ন সম্বৃত চুল পর্য্যন্ত যেন অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় ভরপুর হইয়া উঠিল।

ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া সে যখন মুখ তুলিয়া আবার বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে আপনি বাঁচান।' তখন দেখিলাম, সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিযাছে বটে, কিন্তু তাহার গলার স্বর তখনও কাঁপিতেছে।

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনার দাদা অ্যারেষ্ট হয়েছেন, আমি শুনেছি—কিন্তু—'

সত্যবতী ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, 'দাদা নির্দ্দোষ, তিনি কিছু জানেন না—বিনা অপরাধে তাঁকে—' বলিতে বলিতে আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যোমকেশ ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়াছে বুঝিলাম, কিন্তু সে শান্ত ভাবেই বলিল, 'কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে—'

সত্যবতী বলিল, 'সে সব মিথ্যে প্রমাণ। দাদা কখনও টাকার লোভে কাউকে খুন করতে পারেন না। আপনি জানেন না—তাঁর মতন লোক; ব্যোমকেশবাবু, আমরা মেসোমশায়ের টাকা চাই না, আপনি শুধু দাদাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, আমরা আপনার পায়ে কেনা হয়ে থাকব।' তাহার দুই চোখ দিয়া ধারার মত অশ্রু

ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সে আর তাহা মুছিবার চেষ্টা করিল না—বোধ করি, জানিতেই পারিল না।

ব্যোমকেশ এবার যখন কথা কহিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব গাঢ়তা লক্ষ্য করিলাম, সে বলিল, 'আপনার দাদা যদি সত্যই নির্দ্দোষ হন, আমি প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করব—কিন্তু—'

'দাদা নির্দ্দোষ, আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না—একটা মাছিকে মারাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—' বলিতে বলিতে সে হঠাৎ নতজানু হইয়া ব্যোমকেশের পায়ের উপর হাত রাখিল।

'ও কি করছেন? উঠে বসুন—উঠে বসুন।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পা সরাইয়া লইল।

'আপনি আগে বলুন, দাদাকে ছেড়ে দেবেন?'

ব্যোমকেশ দুই হাত ধরিয়া সত্যবতীকে জোর করিয়া তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল, তার পর তাহার সম্মুখে বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আপনি ভুল করছেন—সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার মালিক আমি নই—পুলিস। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করতে হ'লে সবকথা আমার জানা দরকার। বুঝছেন না, আমার কাছ থেকে যতক্ষণ আপনি কথা গোপন করবেন, ততক্ষণ কোনও সাহায্যই আমি করতে পারব না।'

চক্ষু নত করিয়া সত্যবতী বলিল, 'আমি ত কোনও কথা গোপন করি নি।'

'করেছেন। আপনি সেই রাত্রেই করালীবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে বলেন নি।'

ত্রাসবিস্ফারিত নেত্রে সত্যবতী ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইল, তার পর বুকে মুখ গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ নরম স্বরে বলিল, 'এখন সব কথা বলবেন কি ?'

কাতর চোখদুটি তুলিয়া সত্যব্রতী বলিল, 'কিন্তু সে কথা আমি কি ক'রে বলব ? তাতে যে দাদার ওপরেই সব দোষ গিয়ে পড়বে।'

অনুনয়ের কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, আপনার দাদা যদি নির্দ্দোষ হন, তা হ'লে সত্যি কথা বললে তাঁর কোনও অনিষ্ট হবে না, আপনি নির্ভযে সমস্ত খুলে বলুন, কোনো কথা গোপন করবেন না।'

সত্যবতী অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া ভাবিল, শেষে ভগ্ন স্বরে বলিল, 'আচ্ছা, বলছি। আমার যে আর উপায় নেই—' উদ্গত অশ্রু আঁচল দিয়া মুছিয়া নিজেকে ঈষৎ শান্ত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'সে দিন সন্ধ্যেবেলা মেসোমশায়ের সঙ্গে দাদার একটু বচসা হয়েছিল। মেসোমশাই দাদাকে সব সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়েছিলেন, তাই নিযে মতিদা'র স'ঙ্গ দুপুরবেলা তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরে তাই শুনে দাদা মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলেন যে, তিনি সব সম্পত্তি চান না, সম্পত্তি যেন সকলকে সমান ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। মেসোমশাই কোনও রকম তর্ক সইতে পারতেন না, তিনি রেগে উঠে বললেন, 'আমার কথার ওপর কথা। বেরোও এখান থেকে—তোমাকে এক পয়সা দেব না।'

'মেসোমশাই যে এ কথায় রাগ করবেন, তা দাদা বুঝ্‌তে পারেন নি ; তিনি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফণীদা'র ঘরে গিয়ে বসলেন। ফণীদা খোঁড়া মানুষ, বাইরে বেরুতে পারেন না—তাই দাদা রোজ সন্ধ্যে-

বেলা তাঁর কাছে ব'সে খানিকক্ষণ গল্প করতেন। ফণীদা'কে আপনারা বোধ হয় দেখেছেন? তিনি ইস্কুলে—কলেজে পড়েন নি বটে, কিন্তু বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন। তাঁর আলমারির বই দেখেই বুঝতে পারবেন—কত রকম বিষয়ে তাঁর দখল আছে। অনেক সময় আমি তাঁর কাছে পড়া ব'লে নিয়েছি।

'মেসোমশায়ের সঙ্গে বচসা হওয়াতে দাদার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তিনি রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমাকে বললেন, 'সত্য, আমি বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি, সাড়ে এগারটার সময় ফিরব—সদর-দরজা খুলে রাখিস।' এই ব'লে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলেন।

'আমাদের বামুনঠাকুর, রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর বাইরে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিজের দেশের লোকের আড্ডায় গল্প-গুজব করে, আমি জানতুম—তাই দাদাকে দোর খুলে দেবার জন্য আমি আর জেগে রইলুম না। রাত্রি দশটার পর হাঁড়ি-হেঁসেল উঠে গেলে আমিও গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'ল, যেন দাদার ঘরে একটা শব্দ শুনতে পেলুম। মেঝের ওপর একটা ভারি জিনিষ—টেবিল কি বাক্স সরালে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ। ভাবলুম দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এলেন।

'আবার ঘুমবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু কি জানি কেন ঘুম এল না—চোখ চেয়েই শুয়ে রইলুম। দাদার ঘর থেকে আর কোনও সাড়া পেলুম না; মনে করলাম তিনি শুয়ে পড়েছেন।

'এই ভাবে মিনিট পনের কেটে যাবার পর—বারান্দায় একটা খুব

মৃদু শব্দ শুনতে পেলুম, যেন কে পা টিপে টিপে যাচ্ছে। ভারী আশ্চর্য্য মনে হ'ল; দাদা ত অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন, তবে কে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে? আমি আস্তে আস্তে উঠ্‌লুম; দরজা একটু ফাঁক ক'রে দেখলুম—দাদা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। চাঁদের আলো বারান্দায় প'ড়েছিল, দাদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কথা; আপনার দাদার পায়ে জুতো ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর হাতে কিছু ছিল।'

'না।'

'কিছু না? একটা কাগজ কিম্বা শিশি?'

'কিছু না।'

'তখন কটা বেজেছিল; দেখেছিলেন কি?'

সত্যবতী বলিল, 'দেখবার দরকার হয় নি, তখন সহরের সব ঘড়ীতেই বারোটা বাজ্‌ছিল।'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি চ'পা উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল, সে বলিল, 'তার পর ব'লে যান।'

সত্যবতী বলিতে লাগিল, 'প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। দাদা পনের মিনিট আগে ফিরে এসেছেন—তাঁর ঘরে আওয়াজ শুনে জানতে পেরেছি—তবে আবার তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? হঠাৎ মনে হ'ল, হয় ত মেসোমশায়ের শরীর খারাপ হয়েছে, তাঁর ঘরেই গিয়েছিলেন। মেসোমশাই কখনও কখনও রাত্রিবেলা বাতের বেদনায় কষ্ট পেতেন—ঘুম হ'ত না। তখন তাঁকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হ'ত। আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে মেসোমশায়ের ঘরের দিকে গেলুম।

'তাঁর ঘরের দোর রাত্রে বরাবরই খোলা থাকে—আমি ঘরে ঢুকলুম। ঘর অন্ধকার—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও কি রকম একটা গন্ধ নাকে এল। গন্ধটা যে ঠিক কি রকম তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না—তীব্র গন্ধ নয়, অথচ—'

'মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।'

'হুঁ—ক্লোরোফর্ম। তার পর?'

'দোরের পাশেই সুইচ্। আলো জ্বেলে দেখলুম, মেসোমশাই খাটে শুয়ে আছেন—ঠিক যেন ঘুমুচ্ছেন। তাঁর শোবার ভঙ্গী দেখে একবারও মনে হয় না যে তিনি—; কিন্তু তবু কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। সেই গন্ধটা যেন একটা ভিজে ন্যাকড়ার মতন আমার নিশ্বাস বন্ধ করবার উপক্রম করলে।

'কিছুক্ষণ আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, ওটা ওষুধের গন্ধ, মেসোমশাই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'পা কাঁপছিল, তবু সন্তর্পণে তাঁর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঝুঁকে দেখলুম—তাঁর নিশ্বাস পড়ছে না। তখন আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা আমি বোঝাতে পারব না—মনে হচ্ছে এইবার অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যাব। বোধ হয়, মাথাটা ঘুরেও উঠেছিল; নিজের সাম্‌লাবার জন্যে আমি মেসোমশায়ের বালিশের ওপর হাত রাখলুম। হাতটা ঠিক তাঁর ঘাড়ের পাশেই পড়েছিল—একটা কাঁটার মত কি জিনিষ হাতে ফুটল। দেখ্‌লুম একটা ছুঁচ তাঁর ঘাড়ে আমূল বেঁধানো—ছুঁচে তখনও সুতো পরানো রয়েছে।

'আমি আর সেখানে থাকতে পারলুম না। কিন্তু কি ক'রে যে আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম, তাও জানি না। যখন ভাল ক'রে চেতনা ফিরে এল, তখন নিজের বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপচি আর কাঁদছি।

'তার পর ত সবই আপনি জানেন। দাদাকে আমি সন্দেহ করি নি, আমি জানি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না, তবু এ কথা যে কাউকে বলা চলবে না, তাও বুঝতে দেরী হ'ল না। পরদিন সকালবেলা কোনো-রকমে চা তৈরী ক'রে নিয়ে মেসোমশায়ের ঘরে গেলুম—'

সত্যবতীর স্বর ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল। তাহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা, চোখের আতঙ্ক-স্মৃতি-পূর্ণ দৃষ্টি হইতে বুঝিতে পারিলাম, কি অসীম সংশয় ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়া সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা তাহার কাটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চোখ দুটো জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল 'আপনার মত অসাধারণ মেয়ে আমি দেখি নি। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি ক'রে মূর্চ্ছা—হিষ্টিরিয়ার ঠেলায় বাড়ী মাথায় করত—কিন্তু আপনি—'

সত্যবতী ভাঙ্গা-গলায় বলিল, 'শুধু দাদার জন্যে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আপনি এখন তা হ'লে বাড়ী ফিরে যান। কাল সকালে আমি আপনাদের ওখানে যাব।'

সত্যবতীও উঠিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু আপনি ত কিছু বললেন না?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'বলবার কিছু নেই। আপনাকে আশা দিয়ে শেষে যদি কিছু না করতে পারি? এর মধ্যে বিধুবাবু নামক একটি আস্ত—ইয়ে আছেন কি-না, তাই একটু ভয়। যা হোক, এইটুকু বলতে

পারি যে, আজ আপনি যে সব কথা বললেন, তা যদি প্রথমেই বলতেন, তা হ'লে হয় ত কোনও গোলমাল হ'ত না।'

অশ্রুপূর্ণ চোখে সত্যবতী বলিল, 'আমি যা বললুম, তাতে দাদার কোনও অনিষ্ট হবে না? সত্যি বলছেন? ব্যোমকেশবাবু, আমার আর কেউ নেই—' তাহার স্বর কান্নায় বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি গিয়া সদর-দরজাটা খুলিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আপনি আর দেরী করবেন না—রাত হয়ে গেছে। আমাদের এটা ব্যাচেলর এষ্ট্যাব্‌লিশ্‌মেণ্ট—বুঝলেন না—'

সত্যবতী একটু ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে চৌকাঠ পার হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। সত্যবতী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতা-নিষিক্ত মিনতি-পূর্ণ চোখ দুটি আমি দেখিতে পাইলাম—তারপর সে নিঃশব্দে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল, ঘড়ী দেখিয়া বলিল, 'সাতটা বেজে গেছে।' তারপর মনে মনে কি হিসাব করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বলিল, 'এখনও ঢের সময় আছে।'

আমি সাগ্রহে তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম, 'ব্যোমকেশ, কি বুঝলে? আমি ত এমন কিছু—কিন্তু তোমার ভাব দেখে বোধ হ'ল, যেন তুমি ভেতরের কথা বুঝ্‌তে পেরেছ।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'এখনও সব বুঝি নি।'

আমি বলিলাম, যাই বল, সুকুমারের বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরুতর হোক, আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সে খুন করে নি।'

ব্যোমকেশ হাসিল—'তবে কে করেছে?'

'তা জানি না—কিন্তু সুকুমার নয়।

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। বুঝিলাম, এখন কিছু বলিবে না। আমিও বসিয়া এই ব্যাপারের অদ্ভুত জটিলতার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে ব্যোমকেশ একটা প্রশ্ন করিল, 'সত্যবতীকে সুন্দরী বলা বোধ হয় চলে না—না?'

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'কেন বল দেখি?'

'না অমনি জিজ্ঞাসা করছি। সাধারণে বোধ হয় কালোই বলবে।'

বর্তমান সমস্যার সঙ্গে সত্যবতীর চেহারার কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের মন কোন্ দুর্গম পথে চলিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, লোকে তাকে কালোই বলবে, কিন্তু কুৎসিত বোধ হয় বলতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—'কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'—কেমন?—ভাল কথা, অজিত, তোমার বয়স কত হ'ল বল দেখি?'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'আমার বয়স—'

'হ্যাঁ—কত বছর কমাস কদিন, ঠিক হিসেব ক'রে বল।'

কে জানে—হয় ত আমার বয়সের হিসাবের মধ্যেই মুরারীবাবুর মৃত্যু-রহস্যটা চাপা পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশের অসাধ্য কার্য্য নাই। আমি মনে মনে গণনা করিয়া বলিলাম, 'আমার বয়স হ'ল ঊনত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিন।—কেন?'

ব্যোমকেশ একটা ভারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড়। বাঁচা গেল। কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'মানে ?'

'মানে কিছুই নেই। কিন্তু ও কথা এখন থাক। এই ব্যাপার নিযে ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। চল আজ নাইট-শো'তে বায়স্কোপ দেখে আসি।'

ব্যোমকেশ কখনও বায়স্কোপে যায় না, বায়স্কোপ থিযেটার সে ভালই বাসে না। তাই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বলিলাম, 'তোমার আজ হ'ল কি বল দেখি ? একেবারে খেপচুরিয়াস্ মেরে গেলে না কি ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অসম্ভব নয়। আমি লগনচাঁদা ছেলে—ভট্টাচায্যিমশাই কুষ্ঠী তৈয়ার করেই বলেছিলেন, এ ছেলে ঘোর উন্মাদ হবে। কিন্তু আর দেরী নয়, চল খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। 'চিত্রা'য় ক'দিন থেকে একটা খুব ভাল ফিল্ম দেখাচ্ছে।'

আহারাদি করিয়া বায়স্কোপে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি সাড়ে নয়টায় চিত্র-প্রদর্শন আরম্ভ হইল। ছবিটা কিছু দীর্ঘ—শেষ হইতে প্রায় পৌনে বারোটা বাজিল।

অনেক দূর যাইতে হইবে—বাসও দু'একখানা ছিল ; আমি একটাতে উঠিবার উপক্রম করিতেছি, ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, হেঁটেই চল না খানিকদূর।' বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ছাড়িয়া সে যখন পাশের একটা সরু রাস্তা ধরিল, তখন বুঝিলাম, যে করালীবাবুর বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। এত রাত্রে সেখানে কি প্রয়োজন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। যাহা হউক, বিনা আপত্তিতে তাহার সঙ্গে চলিলাম।

স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু বেশী দ্রুতপদেই আমরা চলিতেছিলাম, তবু করালীবাবুর বাড়ী পৌঁছিতে অনেকটা সময় লাগিল। করালীবাবুর দরজার পাশেই একটা গ্যাস-পোষ্ট ছিল, তাহার নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ হাতের আস্তিন সরাইয়া ঘড়ী দেখিল। কিন্তু ঘড়ী দেখিবার প্রয়োজন ছিল না, ঠিক এই সময় অনেকগুলা ঘড়ী চারিদিক হইতে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিয়া দিল।

ব্যোমকেশ উৎফুল্লভাবে আমার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, 'হয়েছে। চল, এবার একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।'

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা করালীবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কয়েক জন পুলিশ-কর্ম্মচারী ও বিধুবাবু হাজির ছিলেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া বিধুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু, আপনি শুনেছেন বোধ হয় যে, সুকুমারকে অ্যারেষ্ট্ করেছি। সে-ই যে আসল আসামী, তা আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম—আমি শুধু তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলুম।'

'বলেন কি?' ব্যোমকেশ মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া এমন ভাবে বিধুবাবুর পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যেন খেলাইবার যন্ত্রটা সত্যসত্যই সেখানে বিদ্যমান আছে। ইন্স্পেক্টর সাব-ইন্স্পেক্টর হাসি চাপিবার চেষ্টায় উৎকট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিধুবাবু একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, 'আপনি আজ কি মনে ক'রে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। শুনলুম, আর একটা নূতন উইল বেরিয়েছে—তাই সেটা দেখতে এলুম।'

উইল ব্যোমকেশকে দেখাইবেন কি না, তাহা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিধুবাবু অনিচ্ছাভরে ফাইল হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'দেখবেন, ছিঁড়ে ফেলবেন না যেন। এই উইলটাই হচ্ছে সুকুমারের বিরুদ্ধে সেরা প্রমাণ। করালীবাবুকে খুন করবার পর এটা সুকুমার চুরি ক'রে নিজের ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিল—কোথায় রেখেছিল জানেন? তার ঘরে যে তিনটে ট্রাঙ্ক উপ্‌রো-উপ্‌রি ক'রে রাখা আছে, তারই নীচের ট্রাঙ্কটার তলায়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, সবই যে মিলে যাচ্ছে দেখছি! কিন্তু একটা কথা বলুন ত, সুকুমার উইলখানা ছিঁড়ে ফেললে না কেন?'

বিধুবাবু নাকের মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'হুঁঃ, সে বুদ্ধি থাকলে ত! ভেবেছিল, আমরা তার ঘর সার্চ্চই করব না।'

'সুকুমার কিছু বল্‌লে?'

'কি আর বলবে। সবাই যা ব'লে থাকে, যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বললে, 'আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ উইলখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত তাহার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমিও গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, শাদা এক-তা ফুলস্ক্যাপ্‌ কাগজের উপর লেখা রহিয়াছে—

'অদ্য ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি সজ্ঞানে সুস্থশরীরে এক উইল করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা আমার কনিষ্ঠ ভাগিনের শ্রীমান্ ফণিভূষণ পাইবে। পূর্ব্বে যে সকল উইল করিয়াছিলাম, তাহা অত্র দ্বারা নাকচ্‌ করা হইল। স্বাক্ষর—শ্রীকরালীচরণ বসু।'

উইল পড়িয়া ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল, দেখিলাম, তাহার মুখ

উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, 'বিধুবাবু, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! উইল যে—' বলিয়া কাগজখানা বিধুবাবুর সম্মুখে পাতিয়া ধরিল।

বিধুবাবু বিস্মিতভাবে সেটা আগাগোড়া পড়িয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে? আমি ত কিছু—'

'দেখছেন না?' বলিয়া স্বাক্ষরের নীচেটা আঙুল দিয়া দেখাইল।

তখন বিধুবাবু চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া বলিলেন, 'ওঃ, সাক্ষী—'

'চুপ!' ব্যোমকেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়া ঘরের ভেজানো দরজার দিকে তাকাইল। কিছুক্ষণ উৎকর্ণভাবে শুনিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া হঠাৎ কবাট খুলিয়া ফেলিল।

মাখনলাল দরজায় কান পাতিয়া শুনিতেছিল, সবেগে পলাইবার চেষ্টা করিল। ব্যোমকেশ তাহাকে কামিজের গলা ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল; জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিল 'ইন্‌স্পেক্টর-বাবু, একে ধ'রে রাখুন—ছাড়বেন না। আর, কথা কইতে দেবেন না!'

মাখন ভয়ে আধমরা হইয়া গিয়াছিল, বলিল, 'আমি—'

'চুপ! বিধুবাবু, একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে আনিয়ে নিন। আসামীর নাম দেবার দরকার নেই—নামটা পরে ভর্ত্তি ক'রে নিলেই হবে।' বিধুবাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া খাটো গলায় বলিল, 'ততক্ষণ এই লোকটাকে ল্যাজে খেলান্—আমরা আসছি।'

বিধুবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'পরে হবে। ইতিমধ্যে আপনি ওয়ারেণ্টখানা আনিয়ে রাখুন। এস অজিত।'

দ্রুতপদে ব্যোমকেশ উপরে উঠিয়া গিয়া ফণীর কবাটে টোকা মারিল।

ফণী আসিয়া দরজা খুলিয়া সম্মুখে ব্যোমকেশকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের ব্যস্তসমস্ত ভাব আর ছিল না, সে সহাস্যমুখে বলিল, 'আপনি শুনে সুখী হবেন, করালীবাবুর প্রকৃত হত্যাকারী কে—তা আমরা জানতে পেরেছি।'

ফণী একটু মলিন হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা গ্রেপ্তার হয়েছেন জানি। কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস না হবারই ত কথা। তাঁর ঘর থেকে আর একটা উইল বেরিয়েছে—সে উইলের ওয়ারিস আপনি!'

ফণী বলিল, তাও শুনেছি। কথাটা শুনে অবধি আমার মনটা যেন তেতো হয়ে গেছে। তুচ্ছ টাকার জন্যে মামার অপঘাতে প্রাণ গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'অর্থমনর্থম্! তিনি আমায় সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, এতেও আমি খুসী হ'তে পারছি না ব্যোমকেশবাবু! নাই দিতেন টাকা—তবু ত তিনি বেঁচে থাকতেন।'

ব্যোমকেশ বইয়ের সেল্‌ফটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বইগুলা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'তা ত বটেই। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ—শঙ্করাচার্য্য ত আর মিথ্যে বলেন নি! এটা কি বই? ফিজিও-লজি! সুকুমারবাবুর বই দেখছি।' বইখানা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ নামপত্রটা দেখিল।

ফণী একটু হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর ডাক্তারি বই পড়তে দিতেন। কি আশ্চর্য্য দেখুন। এ বাড়ীতে আমি সুকুমারদাকেই সব চেয়ে আপনার লোক মনে করতুম—এমন কি, দাদাদের চেয়েও—অথচ তিনিই—'

ব্যোমকেশ আরও কতকগুলি বই খুলিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি ত দেখছি একজন পাকা গ্রন্থকীট! সব বই দাগ দিয়ে পড়েছেন।'

ফণী বলিল, 'হ্যাঁ। পড়া ছাড়া আর ত কোনও অ্যামুজমেণ্ট নেই—সঙ্গীও নেই। এক সুকুমারদা রোজ সন্ধ্যাবেলা খানিকক্ষণ আমার কাছে এসে বসতেন। আচ্ছা, ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সুকুমারদা এ কাজ করেছেন? কোনও সন্দেহ নেই?'

ব্যোমকেশ চেয়ারে আসিয়া বসিল, 'অপরাধীর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে সন্দেহের বিশেষ স্থান নেই। বসুন—আপনাকে সব কথা বলছি।'

ফণী বিছানায় উপবেশন করিল, আমি তাহার পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, হত্যা দু'রকম হয়—এক রাগের মাথায় হত্যা, যাকে crime of passiom বলে; আর এক সঙ্কল্প ক'রে হত্যা। রাগের মাথায় যে-লোক খুন করে, তাকে ধরা কঠিন নয়—অধিকাংশ সময় সে নিজেই ধরা দেয়। কিন্তু যে লোক ভেবে-চিন্তে নিজেকে যথা-সম্ভব সন্দেহমুক্ত ক'রে খুন করে, তাকে ধরাই কঠিন হয়ে পড়ে। তখন কে আসামী, তার নাম আমরা জানতে পারি না, পাঁচজন লোকের ওপর সন্দেহ হয়। এ রকম ক্ষেত্রে আমরা কোন্ পথে চল্‌ব? তখন আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে—হত্যার প্রণালী থেকে হত্যাকারীর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা।

'বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি—হত্যা-কারী লোকটা একাধারে বোকা এবং চতুর। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত খুন করেছে অথচ নির্বোধের মত খুনের যা-কিছু প্রমাণ, নিজের ঘরে

নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে। বলুন দেখি, সত্যবতীর ছুঁচ দিয়ে খুন করবার কি দরকার ছিল? বাজারে কি ছুঁচ পাওয়া যায় না? আর উইলখানা যত্ন ক'রে লুকিয়ে রাখবার কোনও আবশ্যকতা ছিল কি? ছিঁড়ে ফেল্‌লেই ত সব ল্যাটা চুকে যেত। এ থেকে কি মনে হয়?'

ফণী হাতের উপর চিবুক রাখিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'কি মনে হয?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ব্যক্তি স্বভাবতই নির্ব্বোধ, সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করবে—এ সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে বোকামির ভাণ করতে পারে। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আসামী যেই হোক, সে বুদ্ধিমান।

'কিন্তু বুদ্ধিমান লোকও ভুল করে, বোকা সাজবার চেষ্টাও সব সময সফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও আসামী কয়েকটা ছোট ছোট ভুল করেছিল ব'লে আমি তাকে ধরতে পেরেছি।

ফণী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভুল সে করেছিল?'

'বল্‌ছি।' ব্যোমকেশ পকেট হাঁটকাইয়া একটা শাদা কাগজ বাহির করিল—'কিন্তু তার আগে এ বাড়ীর একটা নক্সা তৈরী ক'রে দেখাতে চাই। একটা পেন্সিল আছে কি? যে কোনও পেন্সিল হলেই চলবে।'

ফণীর বিছানায় বালিসের পাশে একটা বই রাখা ছিল, তাহার ভিতর হইতে সে একটা লাল পেন্সিল বাহির করিয়া দিল।

পেন্সিলটা লইয়া ব্যোমকেশ ভাল করিয়া দেখিল, তার পর মৃদু হাস্যে সেটা পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'থাক, প্ল্যান্ আঁক্‌বার দরকার নেই—মুখেই বলছি। অপরাধী প্রধানতঃ তিনটি ভুল করেছিল। প্রথম —সে গ্রে'র অ্যানাটমির এক যায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ

দিয়েছিল ; দ্বিতীয়—সে বাক্স টানবার সময় একটু শব্দ ক'রে ফেলেছিল ; আর তৃতীয়—সে আইন ভাল জান্‌ত না।'

ফণীর মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা একবারে মড়ার মত হইয়া গিয়াছিল, সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 'আইন জান্‌ত না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আর সেই জন্যেই তার অতবড় অপরাধটা ব্যর্থ হয়ে গেল।'

শুষ্ক অধর লেহন করিয়া ফণী বলিল, 'আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সুকুমারবাবুর ঘর থেকে যে উইলটা বেরিয়েছে—উইল হিসেবে সেটা মূল্যহীন। তাতে সাক্ষীর দস্তখৎ নেই।'

মনে হইল, ফণী এবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা বলিল না ; দৃষ্টিহীন শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া ফণী মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুই হাতে মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে বলিল, 'সব বৃথা—সব মিছে—; ব্যোমকেশবাবু, আমাকে একটু সময় দিন, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'আধ ঘণ্টা সময় আপনাকে দিলুম—তৈরী হয়ে নিন্।' দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'থিম্বলটা অবশ্য ফেলে দিয়েছেন ; সেটা সুকুমারের ঘরে রেখে আসেন নি কেন বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়িতে আঙুল থেকে খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন—না ? তাই হবে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম কার হাত দিয়ে আনালেন ? মাখন ?'

ফণী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আধঘণ্টা পরে আসবেন—'

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিয়া বসিলাম। মাখন তখনও ইন্‌স্‌পেক্টর ও সবইন্‌স্‌পেক্টরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দারুভূত জগন্নাথের মত বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ ভীষণ ভ্রূকুটি করিযা তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি কবে ফণীকে ক্লোরোফর্ম্ম এনে দিযেছ ?'

মাথন চমকাইযা উঠিযা বলিল, 'আমি কিছু জানি না—'

'সত্যি কথা বল, নইলে ওযারেণ্টে তোমার নামই লেখা হবে।'

মাথন কাঁদিযা ফেলিয়া বলিল, 'দোহাই আপনাদের, আমি এ সবের মধ্যে নেই। ফণী বলেছিল রাত্রে তার ঘুম হয না, একফোঁটা ক'রে ক্লোরোফর্ম্ম খেলে ঘুম হবে—তাই—'

'বুঝেছি। এটাকে এবার ছেড়ে দিতে পারেন।'

মুক্তি পাইযা মাখন একেবারে বাড়ী ছাড়িযা দৌড় মারিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওয়ারেণ্ট এসেছে ?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'না, এই এল ব'লে। কিন্তু কার জন্তে ওয়ারেণ্ট ?'

'করালীবাবুকে যে খুন করেছে, তার জন্ত।'

বিধুবাবু অতিশয় অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ-বাবু, এটা পরিহাসের সময় নয। কমিশনার সাহেব আপনাকে একটু স্নেহ করেন ব'লে আপনি আমার ওপর হুকুম চালাচ্ছেন, তাও আমি সহ্য করছি। কিন্তু তামাসা সহ্য করব না।'

'তামাসা নয—এ একেবারে নিরেট সত্যি কথা। শুনুন তবে—' বলিয়া ব্যোমকেশ সংক্ষেপে সমস্ত কথা বিধুবাবুকে বলিল। বিধুবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিলেন,তারপর ধড়মড় করিয়াউঠিয়া বলিলেন, 'তাই যদি হয়, তবে তাকে একলা ফেলে এলেন কি ব'লে ? যদি পালায় ?'

'পালাবে না ; সে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। আর সেইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা ; কারণ, তার অপরাধ আদালতে প্রমাণ করা বিশেষ কঠিন হবে। জুরীদের আপনি জানেন ত—তারা নট্ গিল্টি বলেই আছে।'

'তা ত জানি—কিন্তু—' বিধুবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন।

ঠিক আধঘণ্টা পরে আমরা ফণীর ঘরে গেলাম। বিধুবাবু সর্ব্বপ্রথম দরজা খুলিয়া গট্ গট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই—থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ফণী বিছানায় শুইয়া আছে, বিছানার পাশে তাহার ডান হাতটা ঝুলিতেছে ; আর ঠিক তাহার নীচে মেঝের উপর পুরু হইয়া রক্ত জমিয়াছে। কব্জির কাটা ধমনী হইতে তখনও ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতটা আমি প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু এ ছাড়া তার উপায়ই বা ছিল কি ?'

ফণীর বুকের উপর একখানা চিঠি রাখা ছিল ; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ পাঠ করিল। চিঠিতে এই কয়টি কথা লেখা—

'ব্যোমকেশবাবু,

চলিলাম। আমি খোঁড়া অকর্ম্মণ্য, এখানে আমার অন্ন জুটিবে না—দেখি ওখানে জোটে কি না।

আমি জানি, মোকদ্দমা করিয়া আপনারা আমার ফাঁসী দিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার বাঁচিয়া কোনও লাভ নাই ; যখন টাকাই পাইলাম না, তখন কিসের সুখে বাঁচিব ?

মামাকে খুন করিয়াছি, সে জন্য আমার ক্ষোভ নাই ; তিনি আমাকে

ভালবাসিতেন না, খোঁড়া বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তবে সুকুমারদা'র কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। কিন্তু তিনি ছাড়া দোষ চাপাইবার লোক আর কেহ ছিল না।

তা ছাড়া, তিনি ফাঁসী গেলে আর একটা সুবিধা হইত। কিন্তু যে কথা নিজের বিকলাঙ্গতার লজ্জায় জীবনে কাহাকেও বলিতে পারি নাই, আজ আর তাহা প্রকাশ করিব না।

ক্লোরোফর্ম্ম কোথা হইতে পাইয়াছি, তাহাও বলিব না; যে আনিয়া দিয়াছিল, সে আমার অভিসন্ধি জানিত না। তবে পরে হয় ত সন্দেহ করিয়াছিল।

আপনি আশ্চর্য্য লোক, থিম্বলের কথাটাও ভুলেন নাই! সেটা সত্যই আঙুল হইতে খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চোখে পড়িল। সেটা এই ঘরেই আছে—খুঁজিয়া লইবেন। সে দিন রাত্রিতে সত্যবতীর ঘর হইতে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করিয়াছিলাম,—সে তখন রান্নাঘরে ছিল।

আপনি ছাড়া আমাকে বোধ হয় আর কেহ ধরিতে পারিত না, কিন্তু তবু আপনাকে বিদ্বেষ করিতে পারিতেছি না। বিদায়। ইতি।—

বহুদূরের যাত্রী
ফণিভূষণ কর।'

চিঠিখানি বিধুবাবুর হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার বোধ হয় আর কোনও বাধা নেই। তাঁর ভগিনীকেও জানানো দরকার। তিনি বোধ হয় নিজের ঘরেই আছেন।—চল অজিত।'

সপ্তাহখানেক পরে আমরা দুইজনে আমাদের বসিবার ঘরে অধিষ্ঠিত ছিলাম। বৈকালবেলা, নীরবে চা-পান চলিতেছিল।

গত কয়দিন অপরাহ্ণে ব্যোমকেশ নিয়মিত বাহিরে যাইতেছিল। কোথায় যায়, আমাকে বলে নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার কাছে মাঝে মাঝে এমন দু'একটা গোপনীয় কেস্ আসিত— যাহার কথা আমার কাছেও প্রকাশ করিবার তাহার অধিকার ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজও বেরুবে না কি?'

ঘড়ী দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ।'

একটু সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'নূতন কেস্ হাতে এসেছে, না?'

'কেস? হ্যাঁ—কিন্তু কেসটা বড় গোপনীয়।'

আমি আর ও বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিলাম না, বলিলাম, 'সুকুমারের ব্যাপার সব চুকে গেছে?'

'হ্যাঁ—প্রোবেটের দরখাস্ত করেছে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, ঠিক কি ভাবে কণী খুন করলে, আমাকে বুঝিয়ে বল ত; এখনও ভাল ক'রে জট ছাড়াতে পারছি না।'

চায়ের শূন্য পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা শোন; পরে পরে ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছিল, ব'লে যাচ্ছি—

সে দিন দুপুরবেলা করালীবাবুর সঙ্গে মতিলালের ঝগড়া হ'ল। সন্ধ্যো-বেলা সুকুমার এসে তাই শুনে করালীবাবুকে বোঝাতে গেল। সেখান

থেকে গালাগালি খেয়ে বেরিয়ে ফণীর ঘরে প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত কাটালে; তার পর খেয়ে দেয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেল। এ পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল নেই।'

'না।'

'রাত্রি আটটা থেকে নয়টার মধ্যে—অর্থাৎ সত্যবতী যে সময় রান্না-ঘরে ছিল, সেই সময় ফণী তার ঘর থেকে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করলে। সে বুঝতে পেরেছিল, করালীবাবু আবার উইল বদ্‌লাবেন এবং এবার সে সম্পত্তি পাবে। সে ঠিক করলে, বুড়োকে আর মত বদ্‌লাবার ফুরসৎ দেবে না। বুড়োকে ফণী বিষচক্ষে দেখত; বিকলাঙ্গ লোকের একটা অদ্ভুত মানসিক দুর্ব্বলতা প্রায়ই দেখা যায়—তারা নিজেদের দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে পারে না। ফণী বোধ হয় অনেক দিন থেকেই করালীবাবুকে খুন করবার মৎলব আঁটছিল।

'বামুনঠাকুরের এজেহার থেকে জানা যায়, রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারোটার সময় মতিলাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। গাঁজাখোরদের সময়ের ধারণা থাকে না, তাই বামুনঠাকুর একটু সময়ের গোলমাল ক'রে ফেলেছিল। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, মতিলাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে-ছিল ঠিক এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটে। তার ও-দোষ বরাবরই ছিল —রাত্রে বাড়ী থাকত না।

'সে বেরিয়ে যাবার পর ফণীও নিজের ঘর থেকে বেরুল। মতিলালের ঘর করালীবাবুর শোবার ঘরের ঠিক নীচেই, পাছে পায়ের শব্দ হয়, তাই ফণী এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম্ম করতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল; তার পর সে তাঁর ঘাড়ে অপটু হস্তে ছুঁচ ফোটালে। তিনবার ফোটাবার পর তবে ছুঁচ যথাস্থানে পৌঁছুল।

সুকুমারের মতন ডাক্তারি ছাত্র যদি এ কাজ করত, তা হ'লে তিনবার ফোটাবার দরকার হ'ত না।

'করালীবাবুকে শেষ ক'রে ফণী পাশের ঘরের দেরাজ থেকে তাঁর শেষ উইল বার করলে—দেখলে, উইল তার নামেই বটে।

'এখানে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনও হ'তে পারে যে, ফণী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম্ম ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে উইলটা পড়লে; যখন দেখলে উইল তারই নামে, তখন ফিরে এসে করালীবাবুকে খুন করলে। সে যাই হোক, এই ব্যাপারে তার দশ-বারো মিনিট সময় লাগল।

'এখন কথা হচ্ছে, উইলখানা নিয়ে সে কি করবে? যথাস্থানে রেখে দিলেও পারত, কিন্তু তাতে সুকুমারকে ভাল ক'রে ফাঁসানো যায় না। অথচ নিজেকে বাঁচাতে হ'লে এক জনকে ফাঁসানো চাই-ই।

'উইল আর ক্লোরোফর্ম্মের শিশি সে সুকুমারের ঘরে লুকিয়ে রেখে এল। জানত, এত বড় কাণ্ডের পর সব ঘর খানাতল্লাস হবেই—তখন উইলও বেরুবে। এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—সুকুমারের ফাঁসি হবে আর সে সম্পত্তি পাবে.

'উইলটা ট্রাঙ্কের তলায় রাখতে গিয়ে একটু শব্দ হয়েছিল—সেই শব্দে সত্যবতীর ঘুম ভেঙে যায়। তখন রাত্রি পৌনে বারোটা। সে ভাবলে, তার দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এল। কিন্তু বাস্তবিক সুকুমার তখন ফিরতে পারে না; সে ফিরেছে—যখন ঘড়ীতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে—

'আর কিছু বোঝাবার দরকার আছে কি?'

'উইলে সাক্ষীর দস্তখৎ না থাকার কারণ কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'আমার মনে হয়, খাওয়া-দাওয়ার

পর করালীবাবু উইলটা লিখেছিলেন, তাই আর রাত্রে কিছু করেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর ইচ্ছে ছিল, পরদিন সকালে চাকর-বামুনকে দিয়ে সহি দস্তখৎ করিয়ে নেবেন।'

নীরবে ধূম পান করিয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর সঙ্গে তার পর আর দেখা হয়েছিল? সে কি বললে? খুব ধন্যবাদ দিলে ত?'

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না। শুধু গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম করলে।'

'চমৎকার মেয়ে কিন্তু—না?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জ্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, সে কথাটা মনে আছে ত?'

'হ্যাঁ—কেন?'

উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। মিনিট পাঁচেক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমি বলিলাম, 'তোমার গোপনীয় মক্কেল ত ভারী সৌখীন লোক দেখছি, সিল্কের পাঞ্জাবী পরা ডিটেক্‌টিব না হ'লে মন ওঠে না!'

এসেন্স-মাখানো রুমালে মুখ মুছিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। সত্য অন্বেষণ ত আর চাট্টিখানি কথা নয়, অনেক তোড়-জোড় দরকার।'

আমি বলিলাম, 'সত্য অন্বেষণ ত অনেক দিন থেকেই করছ, কৈ এত সাজ-সজ্জা ত কখনো দেখি নি।'

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সত্য অন্বেষণ আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।'

'তার মানে ?'

'তার মানে অতি গভীর। চললুম।' মুচ্‌কি হাসিয়া ব্যোমকেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

'সত্য—ওঃ।' আমি লাফাইয়া গিয়া তাহার কাঁধ চাপিয়া ধরিলাম, —'সত্যবতী! এ ক'দিন ধ'রে ঐ মহা সত্যটি অন্বেষণ করা হচ্ছে বুঝি ? অ্যাঁ—ব্যোমকেশ! শেষে তোমার এই দশা! কবি তা হ'লে ঠিক ব'লেছেন—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবরদার! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, অর্থাৎ সম্পর্কে তার ভাসুর। ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলবে না। এবার থেকে আমিও তোমায় দাদা ব'লে ডাকব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে এত ভয় কেন ?'

সে বলিল, 'লেখক জাতটাকেই আমি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'বেশ, দাদাই হলুম তা হ'লে।' ব্যোমকেশের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলাম, 'যাও ভাই, চারটে বাজে, এবার জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়। আশীর্ব্বাদ করি, সত্যের প্রতি যেন তোমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গেল।

শেষ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শরদিন্দুবাবুর গ্রন্থসমূহ

ঝিন্দের বন্দী ... ...

ব্যোমকেশের গল্প ... ...

বিষকন্যা ... ...

বন্ধু ... ...

পথ বেঁধে দিল ... ...

কালকূট ... ...

কালিদাস ... ...

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি বিশিষ্ট পুস্তক

অলকা মুখোপাধ্যায়ের

নন্দিতা ১॥০

বীরেন্দ্র বিশীর

অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইন্‌ডাসট্রি কোং ১৲

কানাই বসুর

পয়লা এপ্রিল ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

কালবৈশাখী ১॥০ জলের আল্পনা ১॥০

আলেয়ার আলো ১॥০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

উপনিবেশ

ঘটনাবহুল নূতন উপন্যাস

ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ···সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এক রহস্যময় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মী নরনারীদের বিচিত্র কার্য্যধারা জীবনযাত্রার অপরূপ ছবি···প্রথম পর্ব্ব দাম—১॥০

পুষ্পলতা দেবীর

মরুতৃষ্ণা

সদ্যপ্রকাশিত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস দাম—৩৲

৮৩ সি. বি. ৩০শে